

‘দেয়ালের লেখা : এক অন্তহীন প্রকীর্ণ শিল্পকথা’-পড়ার ভূমিকা-পুস্তিকা

# দেয়ালের লেখা

এক অন্তহীন প্রকীর্ণ শিল্পকথা

অনন্ত জানা



তারা মিষ্টান্ন ভাঙার

পালুমা

ফিলিস্তিন



ইয়ের বন্ধে ফেন  
না হাশিবত





দেমা করো বাপের

কার

স্বা জা

ক বা মা জি বাহনী

শ্রমজা

‘দেয়ালের লেখা : এক অন্তহীন প্রকীর্ণ শিল্পকথা’-পড়ার ভূমিকা-পুস্তিকা

# দেয়ালের লেখা

এক অন্তহীন প্রকীর্ণ শিল্পকথা

অনন্ত জানা



সুপ্রকাশ

‘দেয়ালের লেখা : এক অন্তহীন প্রকীর্ণ শিল্পকথা’-পড়ার ভূমিকা-পুস্তিকা

যে সফলতার আনন্দে আমাদের কখনও কেউ ডাকেনি  
যে আলোর উৎসবে কখনও নিমন্ত্রণ হয়নি...  
সেই আলো আর আনন্দকে

মূল বইয়ের নির্বাচিত অংশবিশেষ, এই ভূমিকা-পুস্তিকা  
সুপ্রকাশের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে আন্তর্জালে বিতরিত

স্বত্ব : সুপ্রকাশ

## অধ্যায়-ক্রম

১. ছেলেবেলার স্টেশনে এক উদাসীন বিকেল
২. সুধাময়ের খোঁজে: সুধার অন্বেষণ
৩. নিরঙ্ককার সন্ধ্যায় সুখালাভ
৪. দ্বিতীয় যাত্রা
৫. আক্ষরিক পথযাত্রার শুরু
৬. উজ্জীবনের সময়নামা
৭. উজ্জীবনের পাঠমালা
৮. লেখালেখির হৃদহৃদিশ
৯. শেখ জালালুদ্দিন কামারুদ্দিন, যতীশ-শিবেশ এবং সুমন
১০. ‘তামাদি’ সময়ের প্রতিসুখ ও শিল্পযাপন
১১. সাইন, সাইনবোর্ড: একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তান্ত
১২. পেইন্টারের অমরত্ব, চিত্রজীবন
১৩. মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে
১৪. পুনরুজ্জীবনের কথাশিল্প, রাস্তার শিল্পী ও দেয়ালের লেখা
১৫. পোস্টার: সাতকাহন পেরিয়ে
১৬. দেয়ালে দেয়ালে কবিতার অগ্নিশিখা: মুছে যায় দেয়ালের সীমারেখা
১৭. দেয়ালে নতুন শিল্পকথা: গ্রাফিক পোস্টার ও গ্রাফিতি

১৮. একটি কবিতার জনপ্রিয়তা এবং দেয়ালে ‘চিকা মারা’র ইতিবৃত্ত

১৯. গ্রাফিতি: দেশীয় সংস্করণ

২০. কলকাতায় গ্রাফিতির বিস্তার

২১. গ্রাফিতি বনাম ক্ষমতার প্রকল্পিত প্রাচীর

২২. ক্ষমতার ছদ্মবেশ, ক্ষমতার আগ্রাসন বনাম গ্রাফিতিক ব্যঙ্গ

২৩. হেমন্তের বেপথু হাওয়া

২৪. জীবনের ছায়াছবি: পরম্পরাহীন পূর্বাপর

২৫. একটি সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত গ্রন্থ, রচনা এবং উল্লেখপঞ্জি

.....  
চিহ্নিত অধ্যায়গুলি এই ভূমিকা-পুস্তিকায় আছে

স্বত্ব : সুপ্রকাশ

## গ্রন্থ-কুলুজি ও রচকের কৈফিয়ৎ

এই রচনাটির একটি সংক্ষেপ-সার একদা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সুপ্রকাশ প্রকাশিত ‘বাংলার স্মৃতির পেশা ও পেশাজীবীরা (প্রথম খণ্ড)’ নামক গ্রন্থে। প্রবন্ধটিতে রচক হিসেবে গৃহীত নাম ছিল সমরজিৎ দাসের। ঐ প্রবন্ধে প্রযুক্তির বেপরোয়া প্রয়োগের ফলে পেশা-হারানো লিখন শিল্পীদের, বিশেষত সাইনবোর্ড লিখিয়ে অক্ষর শিল্পীদের সাম্প্রত-বিপন্নতার ইতিবৃত্তের সূচনার ক্ষণটি সংক্ষেপে ধরা পড়েছিল। বলাই বাহুল্য হরফ-লিখিয়ে শিল্পী হিসেবে প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে বলয়টির উপস্থিতি পূর্বোক্ত রচনায় ঈষৎ দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করেছিল। কিন্তু তখনও বাকি ছিল একজন অকিঞ্চন ‘রাস্তার শিল্পী’ হিসেবে প্রাবন্ধিকের অভিজ্ঞতার বহুমুখ-চাঞ্চল্যে ধ্বস্ত শিল্পজীবনের কথা বলা। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সেই অপেক্ষিত চেষ্টাই করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের বিষয়ের কেন্দ্রে আছে অস্পর্শ শিল্পজীবনের ক্ষীণতনু এক আখ্যান-সূত্র। কিন্তু তা কখন, বর্ণন এবং বয়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার। সেই কারণে রচকের পক্ষ থেকে পাঠকের কাছে নম্র-ভাষ্যে নিজের জ্ঞানকাণ্ডের সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাব্য অকৃতকার্যতা সম্পর্কে আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করাটা আবশ্যিক শুধু নয়, জরুরিও বটে। রাস্তায়, দেয়ালে, প্রাচীরে, মাচায়, মইয়ে, ঘরাধিতে, রঙে-তুলিতে, দেশলাইয়ের খাপে,

কাইবিচি বা শিরিষের আঠায়, ন্যাকড়ায়, স্প্রে-তে, হেঁচা ডালে, কাপড়ে, ব্যবহৃত খবরের কাগজে, সাদা কাগজে, ড্রইং শিটে, কংক্রিটে, বাঁশ-বাখারির বেড়ায়, মাটির দেয়ালে, ক্যানভাসে, কাঠবোর্ডে, টিনে, ম্যাসনাইট কিংবা কোয়ার্ট বা প্রেসবোর্ডে... সে এক বিস্তারিত অ-কর্মকাণ্ড। দিনের গাত্রদাহকারী রোদ অথবা রাতের ভেজা ভেজা অন্ধকারেও এই প্রকীর্ণ শিল্পকথার স্পর্ধিত রূপায়ণ চলতেই থাকে। তার ঘাড়ে যে ইতিহাসের, মানুষের ইতিহাসের দায়! দেয়ালের রেখা থেকে ‘দেয়ালের লেখা’য় উৎকীর্ণ মানুষের কথা সর্বজনের জন্য খোলাখুলি বলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব রাস্তার শিল্পীরা চিরকাল নিজেদের স্বনির্বাচিত দায় বলে গ্রহণ করেছেন বলেই জীবন ও জীবিকার বন্ধন, চাহিদা ও বিপন্নতা সত্ত্বেও রাস্তার শিল্পীরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ামকদের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞাকে, ক্ষমতাবানের রক্তচক্ষুকে চিরকাল উপেক্ষা করতে পেরেছেন।

এই দিক থেকে বিবেচনা করলে কিংবা ‘দেয়ালের লেখা’ শব্দবন্ধের বাচ্যার্থ মোচন করে ভাবার্থে পৌঁছতে চাইলে এটা তেমন অতিশয়োক্তি না-ও হতে পারে যে, ‘দেয়ালের লেখা’ আসলে শিল্পের ইতিহাসের শুধু অংশমাত্র নয়, সামগ্রিকভাবে মানব-‘ইতিহাস’-এরই সমার্থক। দেয়ালের লেখায় মানবসমাজের ভিত্তিকাল থেকে শুরু করে প্রতিটি পরিবর্তন, প্রতিটি ইতিহাসের বাঁক-ফেরার হৃদিশ পাওয়া যায়। মানুষের বেঁচে থাকার, অগ্রবাহনের পথরেখাও দেয়ালের লেখায় উৎকীর্ণ থাকে।

এই গ্রন্থে সুমন নামের অজ্ঞাত শিল্পীর, যিনি রাস্তার বা জনসাধারণের শিল্পী হতে চেয়েছিলেন— তাঁর পথের জীবনের প্রতি-আখ্যানের সূত্রে সেই আবহমান ইতিহাসের একটা পরিচ্ছিন্ন রেখাচিত্র পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন বলেছিলেন ‘বঙ্গালার ইতিহাস নাই’

(বঙ্কিমচন্দ্র: ১২৮১ বঙ্গাব্দ) তখন তিনি একথাও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, সামগ্রিকভাবে ‘ভারতবর্ষীয়দিগের’-ই ইতিহাসবোধের অভাব, ঐতিহাসিক স্মৃতিলালনের ব্যাপারে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে: এই দুর্বলতার একটা বড়ো কারণ বাঙালি তথা ভারতবাসীর অতিরিক্ত দৈব-নির্ভরতা। তাদের কাছে ‘শুভের নাম “দৈব” এবং অশুভের নাম “দুর্দৈব”।’ কিন্তু ইতিহাস হলো মানুষের কীর্তির বিবরণ। সকলেই জানেন যে, সেই দুর্বলতার কারণেই ভারতবর্ষে শুধু নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই চিরকাল শাসকের ইচ্ছামতো তাদের ভাবাদর্শমাত্মক ন্যারেটিভকে ইতিহাসের নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অতীতে রাজা-বাদশাদের পৃষ্ঠপোষিত অনতিহাসকেই ইতিহাস বলে জাহির করা হয়েছে। পুরাণ, কাব্য ও গল্পগাথাকে ভারতবর্ষের আদর্শ হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। সেই কাব্যকাহিনীর আড়ালে মহৎ কবিদের দ্বারা সৃজিত যে-সকল সত্য-যাপনের ইঙ্গিত ছিল তাকে সমস্ত এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় সাধারণজনের আবেগ, সংস্কার ও সর্বোপরি ধর্মীয় ভীতিজারিত অভ্যাসকে কাজে লাগানো হয়েছে। আর এ-সবই হয়েছে রাষ্ট্রের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় থেকে মুষ্টিমেয় শ্রেণীর শাসন ও লাভের জীবনকে ক্রমান্বয়ে ফাঁপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার ভারত শাসনকালে তাদের কলোনি পরিচালনার নীতি অনুযায়ী ইতিহাসের ঔপনিবেশিক ভাষ্য তৈরি করেছেন। ইংরেজদের লেখা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ করেছিলেন এই বলে: ‘সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বই এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শম্যান্ লেথব্রিজ্ প্রভৃতি চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।...আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।’ (বঙ্কিমচন্দ্র: ১২৮৭ বঙ্গাব্দ)

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপের এখনও অপনোদন হয়েছে তা বলা যায় না। বরং বিশ্বজুড়েই ইতিহাসের নামে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিকারের বড়ো বাড়াবাড়ি লক্ষণীয় মাত্রায় দেখা যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ভারতের দুই মহাকাব্যের (ধর্ম-ব্যবসায়ী ও ধর্মব্যবহারী স্বার্থপন্থীদের কাছে যা কিনা সিঁদুর ও চন্দন-প্রলেপিত ধর্মগ্রন্থ) মূল বিষয়টি অবতারবাদীদের ভক্তি-উপাচার হিসেবে নয়— ‘প্রাচীন সমাজবিপ্লব’ রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ‘অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ’। (রবীন্দ্রনাথ: ১৯১৬)

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন মানব-ভবিতব্য বিষয়ে সচেতন ও সংবেদনশীল লেখক-শিল্পী ও স্রষ্টাদের কাছে ইতিহাস আদৌ ভাবাবেগের বিষয় নয়। দেয়ালের লেখা ইতিহাসের সেই আবশ্যিক ভাষ্য যা আসলে মানুষের স্পর্ধার ইতিহাস। ইতিহাস গড়ে তোলার ইতিহাস। ইতিহাসের সত্যকে অনুসরণ করা লেখক শিল্পীদের কাছে নিজস্ব এক যাপনমন্ত্র। দাস-লেখক, দাসানুদাস শিল্পী, ক্ষমতার হাতের তামাক-খেকো ইতিহাস-লেখক, সংকীর্ণতাবাদীদের উচ্ছিষ্টভোগী বুদ্ধি-ব্যবসায়ীদের থেকে রাস্তার শিল্পীদের অবস্থান আলোকবর্ষ দূরে। রাষ্ট্রীয় পোষকতা, অর্থ, সম্মান, স্বীকৃতির অপেক্ষা না-করেই চিরকাল দেয়াল থেকে দেয়ালে ঐরা সমস্ত বিরুদ্ধতাদীর্ণ, প্রতিশোধাত্মক এবং বিপজ্জনক হিংস্রতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে চলেেন। কোনো রক্তচক্ষু, শাস্তির সম্ভাবনাই তাঁদের নিরস্ত করতে পারে না। অপরপক্ষে অকুতোভয় রাস্তার শিল্পীদের কাজে আর শিল্প-প্রকরণে মিশে থাকে আবহমান মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতর ইতিহাস। দেয়ালের লিখন যিনি যত নির্ভুলভাবে পাঠ করতে পারেন— তিনি ততই ইতিহাসের সত্যকে অনুসরণ করে মানবসভ্যতার প্রগতির পথরেখাকে চিহ্নিত করতে পারেন। গ্রন্থটি নির্মাণের মূলে এই কথাটিই শুধুমাত্র আমরা মনে রেখেছি।

এই ধরনের বিষয় নিয়ে আস্ত একটি গ্রন্থ রচনা করা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা, সন্দেহ নেই। লেখালেখির জগতে ধন্যবাদহীন বিন্দ্র দিন ও রাত্রি কাটানোর উত্তেজনার প্রহরগুলি ছাড়া এই গ্রন্থের লেখকের আর কোনো সঞ্চয় নেই।

এক শিল্পীর আত্মানুভূতগ্জনজাত যাপনের অকিঞ্চিৎকর বিবরণ এই রচনার মুখ্য অবলম্বন বা মাধ্যম হলেও লেখালেখির এই অভূত এবং প্রায় অলিখিত ও জটিল ইতিহাসের হৃদিশ পেতে উপাদান হিসেবে পরোক্ষ উৎসগুলিকেই এখানে আবশ্যিকভাবে নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নিতে হয়েছে। এই গ্রন্থে সেই উৎসসমূহের বিশাল পরিধির মধ্যে ত্রিংশীল বিস্তীর্ণ ভূগোল ও ইতিহাসের উপাদানগুলিকে যথাসম্ভব পরীক্ষা করে গ্রহণ করা হলেও আমাদের অনবধানতা, প্রাপ্ত সূত্রের স্বল্পতা বা ভ্রান্তি, কিংবা আমাদের অধ্যয়নের সংকীর্ণতার কারণে সেগুলির ব্যবহার যথাযথ বলে মনে না-ও হতে পারে। সেই সম্ভাব্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠকের কাছে মার্জনা চেয়ে রাখছি। অপরদিকে ইংরেজি বা অন্যান্য দেশি-বিদেশি ভাষার নাম, শব্দ কিংবা পারিভাষিক শব্দাবলীর ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে কিছু অসঙ্গতিও থাকতে পারে। এসব ত্রুটির কারণে রচকের প্রতি কুপিত না-হয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ত্রুটিসমূহ নির্দেশ করে পরবর্তী সংস্করণে রচনাটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করার জন্য পাঠকদের কাছে অনুরোধ জানাই। উল্লেখপঞ্জীটিও অসম্পূর্ণ। কেননা, রচনা ও চিত্রসৌজন্য গ্রহণের সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসাবধানতা বা শৈথিল্যের কারণে সূত্রটি তৎক্ষণাৎ নথিভুক্ত না-করার জন্য পরে সূত্রটির আর সম্মান পাওয়া যায়নি। এমন অনুল্লিখে ত্রুটির পরিবর্তে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা পরবর্তী সংস্করণে নথিভুক্ত করে নেওয়া হবে।

গ্রন্থ ও সূত্রগুলির পরিচয় রচনার শেষে উল্লিখিত হলেও সেই উল্লিখে অকাদেমিক শৃঙ্খলার বিলক্ষণ অভাব থেকে গেল বলে মনে হয়।

আমাদের সাধ্যাতীত প্রযত্ন সত্ত্বেও এই ত্রুটি এড়ানো গেল না। তার প্রধান কারণ সূত্রবিধৃত বিষয়গুলি পাঠ ও গ্রহণকালে কিছু ক্ষেত্রে সেগুলিতে মূল উৎসের অনুল্লেখ। এই তথ্য-বিস্তারনের যুগে এই অনুল্লেখ অনেকটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই অসম্পূর্ণতার আত্মপ্তি পাঠকের পক্ষে যতটা, সংগ্রাহক, সংকলক বা রচকের পক্ষে ততটাই যন্ত্রণাদায়ক। এক্ষেত্রে যে-কোনো ধরনের অনবধানতাজনিত অনুল্লেখও মার্জনীয়।

অনন্ত জানা

*anantajanabooks@gmail.com*

১

ছেলেবেলার স্টেশনে এক উদাসীন বিকেল

সেটা বিগত শতকের নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময়। রাত্ বাংলার একটা মাঝারি মাপের স্টেশনে আরও একগাদা মানুষের সঙ্গে কাঁচা-পাকা চুলওয়ালা একজন মানুষকে নামিয়ে দিয়ে দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের ভারি ভারি চব্বিশ বগি তার প্রলম্বিত সর্পিলা গা টেনে টেনে চলে গেল উত্তরবঙ্গের দিকে।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষটির কোনো বৈশিষ্ট্য নেই— রোগাশোকা, মধ্য-বয়সী, গড় বাঙালির মতোই লম্বত্ব, গাত্রবর্ণ ঈষৎ বাদামি, সাধারণ প্যান্ট। প্যান্টের সঙ্গে হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি পরনে— কাঁধ থেকে বুলছে সুপরিচিত নিত্যযাত্রীদের মতো একটা কালোরঙের সস্তার ছোটো কিট-ব্যাগ। তবু কেন যেন ভদ্রলোককে এখানকার স্থানীয় মানুষ বলে মনে হয় না। মুখে-চোখে, শরীরী ভাষায় কোথায় যেন গাঙ্গেয়-কোমলতা ছেয়ে আছে। ভদ্রলোকের চোখে ছিল আধা-অপরিচিতের উদ্ভ্রান্তি।

বর্ধমান পেরোবার পর এদিককার অনেক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মই একটু নিচু, কিন্তু তুলনায় চওড়া এবং এই অঞ্চলের জনবিরল বসতিগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে থাকা চামের মাঠগুলোর মতোই একটু হা-হা ধরনের, ফাঁকাটে।

প্ল্যাটফর্মের ওপর দোকানপাট নেই বললেই চলে।

যে জনতা ট্রেন থেকে নেমেছিল তারা দ্রুত-পায়ে নিষ্ক্রান্ত হওয়ায় প্ল্যাটফর্মটি অচিরেই জনশূন্যতার নৈঃশব্দে আক্রান্ত হলো। ভদ্রলোক একটু দাঁড়লেন, চারপাশটা একবার দেখে নিলেন। নাহ্, কোনো রেল-কর্মচারিরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এই স্টেশনটির এমন চরিত্রের সঙ্গে তিনি অপরিচিত নন। তিনি জানেন যে, এখানে যত মানুষ ট্রেন থেকে নামে তাদের মধ্যে নব্বই শতাংশই এখানকার বাসিন্দা নন। তাঁরা যাবেন জেলা সদর বা সেখান থেকে বাস ধরে তার আশপাশে কোথাও। কিন্তু জেলা সদরে ট্রেন-যোগাযোগ না-থাকায় এখানে নেমে স্টেশনের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যান্ডি। ট্রেকার বা অন্য কোনো ভাড়ার গাড়িতে বা রাজ্য সড়কে গিয়ে বাস ধরে মহকুমা-সদরে বা জেলা-সদরে যেতে হয়। তাই ট্রেন থেকে নেমে সকলেরই তাড়া থাকে। নিত্যযাত্রীদের অনেকে কয়েকজন মিলে মাসিক বন্দোবস্তে স্থায়ী ভাড়া গাড়িতে সদর থেকে যাতায়াত করে থাকেন।

স্টেশনের এই চরিত্র মানুষটির কাছে যথেষ্ট পরিচিত। কিন্তু সেই পরিচয়ের নাগাল পেতে আরও অন্তত দুটি দশক পেছিয়ে যেতে হবে।

এই আধা-গঞ্জই বাবার চাকরি-সূত্রে থাকতেন তাঁরা— সেই কৈশোরে— সে যেন পুরাকালের কথা। এখানকার নতুন হওয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পোস্টিং ছিলেন বাবা। বড়ো বড়ো শাল গাছের আলোছায়ায় সদ্য-হওয়া হেল্থসেন্টারের হলুদ রঙের নতুন বাড়ি— পাঁচ-ছয়টি ঘর নিয়ে একতলা ছোট স্বাস্থ্যকেন্দ্র। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পূর্বোত্তরে দু-কামরার আধা পাঁচিল-ঘেরা ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার— সেটার বহিরঙ্গের রঙও এলামাটির হলুদের মতো। অদূরে পলাশের নিমন্ত্রণ-ঘেরা রাজ্য সড়ক চলে গেছে বাঁ-দিকে মহকুমা শহর থেকে একেবারে সদর শহরের দিকে। এ-দুয়ের মাঝখানে সুবিস্তৃত হাইফেনের মতো ছিল এই গঞ্জটি।

সে এমন এক ছায়াছন্ন, মায়ানিষিক্ত উতলা সময়!

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল মানুষটির।

প্রথমে টিকিট-কাউন্টারের সামনের চায়ের স্টলটির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

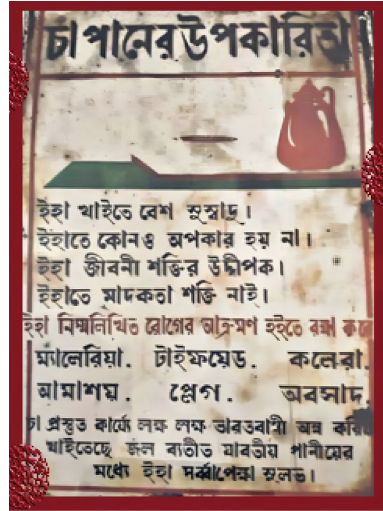
এই দুই দশকে তেমন-কোনো পরিবর্তন হয়নি স্টলটির। রেলের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেঙারের স্টল। পাকাচুলো যে লোকটি সেই সুদূরের দিনে একটা বড়ো অ্যালুমিনিয়ামের মগে যেভাবে ফুটন্ত দুধ-জলের মধ্যে হাতার সাইজের চামচ দিয়ে চিনিসহ চা ঘুঁটতেন, আজও তেমনই ঘুঁটছিলেন। এ কী এস. ওয়াজেদ আলির সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলা ‘ভারতবর্ষ’ নাকি! নাকি টাইম মেশিনের ইন্দ্রজালে তিন দশক পেরিয়ে পৌঁছে গেছেন ছোটবেলায়। সেদিনের মতো ভাঙা বিস্কুটের জন্য হাত পাতবেন নাকি মানুষটার কাছে!

তিনি বুঝলেন— এই মানুষটি আসলে তাঁর ছোটবেলায় দেখা সেদিনের যুবকপুত্র, যিনি সেদিন বাবার নির্দেশনায় মাঝে মাঝে চা ঘুঁটবার ট্রেনিং নিতেন!

ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য, ভাববার জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন।

তিনি এক ভাঁড় চা নিলেন। মাথা তুলে স্টলের ভিতরের দেয়াল আর সামনের সীমানার দিকে তাকালেন।

আশ্চর্য! সেদিনের মজার বিজ্ঞাপনী বোর্ডগুলো আজও তেমনভাবেই সার দিয়ে লাগানো, তেমনই ঝকঝকে উজ্জ্বল, তেমনভাবেই লেখা— ‘যাহাতে



রেল স্টেশনের চায়ের স্টলে পুরোনো আমলের চা-পানের উপকারিতা বিষয়ক এনামেল বোর্ড।

ছবি সৌজন্য: বঙ্গদর্শন

নাহিক মাদকতা দোষ/কিন্তু পানে করে চিত্তপরিতোষা’ সঙ্গে একটি টি-পট থেকে কাপে ধূমায়িত চা ঢালার দৃশ্য। পাশের বোর্ডে আবার এই বয়ানের সঙ্গে একজন গৃহবধুর হাতে প্লেটসহ ধূমায়িত চা— অতিথিকে পরিবেশন করতে যাওয়ার ভঙ্গিতে বধুটি গমনরত; পরের বোর্ডে— ‘চা পানের উপকারিতা ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু, ইহাতে কোনো অপকার হয় না, ইহা জীবনীশক্তির উদ্দীপক, ইহাতে মাদকতা শক্তি নাই’ তার নিচে লেখা— ‘ইহা নিম্নলিখিত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে— ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, প্লেগ, অবসাদ।’ তার সঙ্গে লেখা— ‘চা প্রস্তুত কার্যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অন্ন করিয়া খাইতেছে, জল ব্যতীত যাবতীয় পানীয়ের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সুলভ।’ (প্রহর: ২০২০) সঙ্গে একটি টি-পটের ছবি। তার পরের বোর্ডে ফেজ টুপি-পরা একজন অভিজাত মুসলমান ভদ্রলোকের ছবি, তিনি কাপ হাতে চা পান করছেন, এখানে আবার চা-কে ডাল-রুটির মতো নিত্যদিনের খাবার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশের বোর্ডটির কনটেন্ট আরও মজার, তাতে লেখা— ‘গরম চা পান কর। লাভ হইবে/শীত ও বর্ষার ব্যাধি দূর হইবে/ইহাই একমাত্র গ্রীষ্মের শীতল পানীয়।’ সবার শেষে রীতিমতো ছবি দিয়ে ‘চা প্রস্তুত করিবার প্রণালী’ প্রদর্শন করা হয়েছে। বোর্ড-এর সারির মাঝামাঝি একটি ঈষৎ বড়োমাপের বোর্ডে চা-বাগানের প্রভূষিত সবুজের আন্ততার রাজ্যে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি আহরণরত পিঠে-বুড়ি কামিনদের কাল্পনিক ছবি। এসব বিজ্ঞাপনের কৌতুকে চাপা থাকে মুনাফার ঠিকানা খোঁজা ইংরেজদের চা চাষ প্রচলন ও চা-বাগান স্থাপনা, কুলি-সংগ্রহ, কুলি-কামিনদের প্রতি সীমাহীন অত্যাচারের ইতিহাস। সেই ইতিহাস কিছুটা ধরা থাকে ঐতিহাসিকদের গবেষণায়, দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা চা-কর দর্পণ (পৌষ ১২৮১) নাটকে। আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনী প্রচারের আড়ালে ইংরেজের বেপরোয়া প্রচারকৌশলের আগ্রাসী চরিত্র। যখন ব্রিটিশ শাসকেরা এদেশে চা-এর ব্যবসা প্রচলন করবার জন্য বন্ধপরিষ্কার ছিল, এসব তখনকার বিজ্ঞাপনী বোর্ড। এই

সব বিজ্ঞাপনের শক্তিতে ইউরোপীয় বণিকেরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো ব্যক্তিত্বের চা-পান বিরোধী সর্বাঙ্গিক প্রচারণাকে (প্রফুল্লচন্দ্র রায়: ‘চা-পান না বিষ পান?’)-ও হেলায় পরাজিত করেছিল!



চা-পানের উপকারিতা বিষয়ে স্টেশনের চায়ের স্টলে সারি সারি এনামেলের কাস্টিং বোর্ড।

ছবি: শান্তনু দেবনাথ, সৌজন্য: গ্রহর

বোর্ডগুলো দেখতে দেখতে মানুষটির মধ্যে পুরোনো শৈশব জেগে উঠল, তিনি দেখলেন এতকাল পরেও বোর্ডের লেখাগুলো বেশ জ্যাস্ত আছে। কোথাও কোথাও নতুনের মতো চকচক করছে। তিনি যতদূর দেখেছেন, চা পানের উপকারিতা-সংক্রান্ত এমন বোর্ড পুরোনো স্টেশনগুলোয়— যেমন দমদম, নৈহাটি, ব্যাঙেল, কৃষ্ণনগর ইত্যাদিতে কিছুকাল আগে পর্যন্ত দিব্যি শোভা পেতো। সম্ভবত পুরোনো ভেঙে রেলওয়ে স্টলগুলোতে এখনও সেগুলো টিকে আছে।

বোর্ডগুলোর দীর্ঘজীবিতার রহস্য এই যে, এগুলি এনামেল কাস্টিং-এর বোর্ড। কোনো এককালে পিতল বা তামার মতো মিশ্র ধাতুর ওপর টিনের আস্তরণ দেওয়া হতো আর বাসন তৈরি করলে তার ওপর পোসেলিন প্রলেপ।

মানুষটির গতিক্ষম-চৈতন্যে শিল্প-ইতিহাসের এই ছাত্রটি, নিজের নিরস্তিত্ব ছায়ার দুর্ভেদ্যতা এবং পটারি শিল্পের ইতিহাস অধ্যয়নের সন্ধানী কুহেলিকায় আক্রান্ত হলেন।

এই প্রলেপ বা এনামেলের সফলতার জন্য ফ্রান্সের মানুষ, শখের শিল্পী

বার্নার্ড প্যালিসিকে (১৫০৯/১০-১৫৮৯) কী কাণ্ডটাই না করতে হয়েছিল! প্যালিসি পেশায় ছিলেন জরিপকারী, আর নেশায় শিল্পী। একদা জরিপের কাজে গিয়ে মাটির ওপর এনামেল করা একটি কাপ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে সেই রকম কাপ তৈরির চেষ্টায় প্রভূত শ্রমসাধ্য নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। এটি ফ্রান্সের বাইরের কোনো দেশে তৈরি বলে প্যালিসি অনুমান করেছিলেন। কেননা প্রাচ্যে চিন এবং প্রতীচ্যে ইতালি ছাড়া অন্যত্র এই পালিশ-এনামেলের কাজের রহস্য অজ্ঞাত ছিল।

জানা যায় যে, প্যালিসি মাটির পাত্র তৈরি করে তার ওপরে পালিশ বা এনামেল ধরানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। সেখানে একটিমাত্র পেয়ালায় পালিশ ধরেছিল। তখন তিনি নিজের বাড়িতেই চুল্লি তৈরি করে সেখানে পালিশের উপাদান হিসেবে মাটি আর পাথরের গুঁড়ো গলিয়ে চললেন। সেই সঙ্গে ঠিক কী কী উপাদান গলালে, কী করলে অমন চকচকে পালিশ উঠবে তা বুঝবার জন্য ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজও চলছিল। দু-বছর চুল্লি নিয়ে পরিশ্রমের পর প্রলেপ বা পালিশের মশলার খোঁজ পেলেন তিনি। এজন্য প্রথমে অন্যের চুল্লি ব্যবহার করে একটিমাত্র কাপে পালিশ ধরতে সক্ষম হলেন তিনি। প্যালিসির ধারণা হলো যে, চুল্লির ত্রুটিতেই এটা ঘটেছে। তখন নিজের বাড়িতেই বড়ো একটি চুল্লি নির্মাণ করে কাঠের ইন্ধনের সাহায্যে কাপগুলিতে পালিশের কাজ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। জ্বালানির কাঠ ফুরিয়ে যাওয়ায় বাড়ির আসবাবপত্র ভেঙে গুঁজে দিতে থাকলেন চুল্লিতে। শেষপর্যন্ত মশলা গললো এবং চমৎকার সাদা পালিশে পেয়ালোগুলি ঔজ্জ্বল্য লাভ করল।

কিন্তু এরপরেও এই কাজে নানাবিধ বিচিত্র সমস্যা ও ত্রুটি দেখা দিতে লাগল। পনেরো-ষোলো বছর পর বার্নার্ড প্যালিসি নিজেকে একজন কুস্তকার হিসেবে পরিচয় দেওয়ার সাহস করলেন; কিন্তু তিনি তখনও নিজের শিল্পে উন্নতির জন্য পরিশ্রম করেছিলেন, এবং তাঁর উপার্জনের একটি বড়ো অংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শ্রমে ব্যয় করছিলেন। প্যালিসি

এ-সংক্রান্ত নিরীক্ষার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যা তখনও পর্যন্ত ফ্রান্সে অনার্জিত ছিল। কখনও রঙ গলে গেল, কখনও একটার রঙ আরেকটার গায়ে লেগে গেল— কখনও বার বার চুল্লি ফেটে কাজ পণ্ড হলো। এই সমস্ত ত্রুটির কারণে প্যালিসির এত পরিশ্রম এবং বিরক্তি তৈরি হয়েছিল যে, তাঁর মনে হয়েছিল— তিনি যেন তাঁর জীবনের উপান্তে পৌঁছে গেছেন! (হেনরি মর্লে: ১৮৫২) পনেরো-ষোলো বছর একটানা স্ব-শিক্ষানবিশীর পর প্যালিসি এই কাজে অনেকটা সফল হলেন। পরবর্তী সময়ে অক্ষিত বন্যপ্রাণী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ ও প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণময় সজীবতা পাত্রগুলিতে এনামেল প্রলেপের অলংকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, প্যালিসির ‘সমৃদ্ধ কল্পনা’য় সেগুলি বিস্তৃত মগুনকলায় নন্দিত হয়েছিল।

বার্নার্ড প্যালিসির সেই উদ্ভাস্ত দিনগুলির কথা মনে হওয়ায় আগস্তকের ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসির আভাস দেখা দিল। বাড়ির আসবাবপত্রকে ভেঙে সমিধ হিসেবে চুল্লিতে গুঁজে দেওয়া!

এমন উদ্ভাস্তি ছাড়া পৃথিবীতে কোনো নতুনের উদ্বোধন হয়েছে বলে মনে হয় না!

এটা ঠিকই যে, এইসব এনামেল সাইন বোর্ডের প্রযুক্তি প্যালিসির কাজের থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। তবু প্যালিসির আবিষ্কারের নাছোড় ইতিবৃত্ত শিহরিত করে।

চা-এর স্টলের সামনে হাঁ-করে থাকা অন্যমনস্ক মানুষটি এতক্ষণে নিজের অবস্থান-সম্পর্কে সচেতন হলেন। অবশ্য স্টেশন চত্বর এতটাই জনবিরল যে, এই আগস্তকের বিহ্বলতা লক্ষ্য করার জন্য আশেপাশে কাউকে দেখা গেল না। বিজ্ঞাপনী বোর্ডগুলো ও তার বিষয়বস্তু নিয়ে সেদিনের, ছেলেবেলার সেই বিস্ময় যেন আজ অতীতের কৌতুহল এবং বর্তমানের কৌতুক হয়ে দেখা দিল।

আজ তিনি বুঝলেন— এই বোর্ডগুলো আসলে লোহার ওপর পোস্টেলিনের প্রলেপ লাগিয়ে কাস্টিং-এর সময়েই ছাঁচাই করে ছাপা বা লেখা। এক-সময় এই ধরনের বিজ্ঞাপনী ও পরিচয়জ্ঞাপক বোর্ডের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। শুধু চায়ের স্টলে নয়, স্টেশনগুলির পোস্টে লাগানোর জন্য রেলওয়ের ছোটো ছোটো স্থান-পরিচায়ক বোর্ডগুলিও ছিল এমন এনামেল কাস্টিং-এর। সংবাদপত্রের হকারদের সাইকেলের রডে এমন বোর্ড লাগানো থাকত।

সেসময় তাছাড়া এনামেলের বাসনেরও যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। একদা কলাই-করা বাসন ও অন্যান্য জিনিস তৈরি একটা বড়ো পেশাক্ষেত্র ছিল। এই কলাই প্রয়োগ বা এসব তৈরি করা যাদের পেশা ছিল তাদের কলাইওয়াল বা কলাইগার বলা হতো। পুরোনো দিল্লির মাটিয়া মহল কলাই-করা বাসন তৈরির একটা পরিচিত অঞ্চল। সেখানের গলিতে গলিতে— ‘ভান্দে কলাই করা লো’ অর্থাৎ ‘আপনার বাসনপত্র টিনজাত বা টিনিং করে নিন’— বলে কলাইগারদের হাঁক শোনা যেত। মূলত তামা বা পিতলের বাসনপত্রের ওপরে টিনিং করে রান্না-খাওয়া-পানীয় জলের জন্য ব্যবহার করা যায়। অনেক কলাইয়ের পাত্র লোহার ওপরে এনামেলের পালিশ ধরিয়ে তৈরি করা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের এবং পরে স্টিলের ব্যাপক ব্যবহার বাসনশিল্পে এবং টিনের ব্যবহার সাইন-শিল্পে কলাইয়ের ব্যবহারকে প্রায়-বিলুপ্ত করেছে। একজন প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ভাষ্যকার সন্তোষ দেশাই লিখেছেন— ‘দি মিডিল ক্লাস লাভ অ্যাফেয়ার দি মডার্ন টুক উইং উইথ স্টেনলেস স্টিল।’ অর্থাৎ— ‘আধুনিকের সাথে মধ্যবিত্তের প্রেমের সম্পর্ক স্টেনলেস স্টিলের সাথে যুক্ত হয়েছিল।’ (সন্তোষ দেশাই: ২০১০) এই উচ্চারণে সমাজবেত্তার সংগুপ্ত খেদ অস্পষ্ট অনুভব করা যায়।

এই মুহূর্তে সেই বাস্তবতা আক্ষেপ হয়ে এই নিজন স্টেশনে আমাদের এই আগন্তুক মানুষটিকেও ছুঁয়ে গেল যেন।

‘এমন বোর্ড এখন আর দেখাই যায় না’— একটা প্রশ্বাসিত বেদনা দেখা দিল তাঁর। অথচ যাঁরা এই ধরনের এনামেল বোর্ডের স্কিম করতেন, কনটেন্ট লিখতেন কিংবা অক্ষর আর ছবির বিন্যাস করতেন, মোন্ড বানাতেন বা কাস্টিং-এর কাজ করতেন তাঁরা সৃজনশীলতা ও করণকৌশলের প্রয়োগে কী পরিমাণ দক্ষ ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। বলা যায়— কালাইওয়ালা বা কালাইগারসহ এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তরা কৌলিক বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন।

অন্য পেশা! সে-তো প্রতললগ্ন শিকড় উৎপাতনের সামিল!

চায়ের স্টলের সামনে থেকে সরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে একটুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন মানুষটি।

৯

শেখ জালালুদ্দিন কামারুদ্দিন, যতীশ-শিবেশ এবং সুমন

দেওয়ালে লেখা থেকে কাগজের পোস্টার— এই গঞ্জের এমনতর কাজের সব কিছই এতকাল ধরে যতীশ আর শিবেশই করে এসেছে। কিন্তু সে-সবই বিনা পয়সায় বেগারস্বরূপ। এমন কী পাড়ার কাকিমা, বৌদিরা তাঁদের ইস্কুলে-পড়া বাচ্চাদের ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতা, সদরে বিটি পড়া ভাইপো-ভাইবীদের লেসন প্ল্যানের খাতা, প্র্যাকটিস-টিচিংয়ের পোস্টার— সেসবও বিনি মাগনায় করিয়ে নিয়েছেন। মিষ্টিকথার দাম বা অ্যামেচারের হৃদমুদ যাকে বলে। বিনিময়ে প্রাপ্য শুধু হাসি। প্রথম প্রথম দেয়াল লেখার মুন্সিয়ানা দেখে নেতারা পিঠ চাপড়াতেন, প্রশংসাও করতেন। ইদানীং সেটুকু করাকেও তাঁরা বাছল্য বলে মনে করেন।

এই দুজনের স্থায়ী কোনো পেশা না-থাকায় দুবেলা বাড়ির বাইরে দু-কাপ চায়ের পয়সা জোটাতে দুই শিল্পী (যাদের বাপ-জ্যাঠা-কাকারা, এমন-কী আড়ালে-আবডালে সহযোগী কর্মীরাও শিল্পীর বদলে বুল্‌পি বা কুলপি বলে থাকেন) একেবারে জেরবার।

তবে যতীশ আর শিবেশের ক্ষেত্রে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর উদাহরণ নিতান্তই খাপ খায় না। কেননা তাদের দুজনের কারোর ঘরেই খাবারই নেই! যতীশের বাপের মৃত্যুর পর তাদের বিষে দশেক জমির প্রায়

সবটাই দাদারা বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নেবার পর তার ভাগে নিচু ডোবা জমি বর্তেছে বিঘা-দুয়েক। মা তাঁর ছোটো ছেলে যতীশকে নিয়ে বাস্তু জমির এককোণের ভাঙা ঘরটাতে বসত করেন। তার ভাগের দু-বিঘায় ধান বা গম যা হয় তাতে চাষের খরচ ওঠে না। তাছাড়া অমন জমি চাষ করার পুঁজিও মা-ব্যাটার নেই। সে-জমি তাই ভাগে দেওয়া আছে। যতীশের নিজস্ব কোনো স্থায়ী পেশা ছিল না। চারপাশের দশটা গ্রামে ছেড়ে পালা মুরগির ডিম কিনে এনে গঞ্জের বাজারে বিক্রি করা, পুজোর মরশুমে সদরে গিয়ে কাপড়ের দোকানে কাজ করা, ধান উঠবার সময় চালকলে দৈনিক মজুরিতে জোগাড় দেওয়ার কাজ, গঞ্জের পূবের মাঠে মিশু পাটিদারের গুল কারখানায় লেবারের কাজ, লোকের বাড়িতে বাগানের কাজ— ইত্যাদি যখন যা জোটে আর কী! মা এখনও অসংখ্য পুকুর বা ডোবার ধারে, মাঠেঘাটে গজিয়ে থাকা বেওয়ারিশ শাকপাতা তুলে বাজারে ‘বিক্কিরি’ করে, মুড়ি ভেজে, অপরের ধানসিদ্ধ করে দু-মুঠো জোগান— তাই দুবেলা ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয় যতীশের।

শিবেশের অবস্থা আরও সরেস। বন্ধুর সঙ্গে সদর থেকে পল্লী-এলাকার হাট পর্যন্ত সর্বত্র দৌড়েও ছটকো কাজ ছাড়া আর কিছু জোটে না তার। দাদাদের সংসারে টাকা দিতে পারে না বলে দুবেলা যে খাবার জোটে তাতে পেট ভরে না, কিন্তু প্রত্যহ অভিমাত্রী বেদনার মেঘ জমা হয় শিবেশের শিল্পী-চিন্তাত্মার মর্মদেশে।

তবু হরফে প্রাণসঞ্চারের টানে বার বার তাদের ফিরে আসতে হয় লিপিকর্মের অদ্ভুত স্বপ্ন-নেশায়।

সুমনের সান্নিধ্যে, সাইনবোর্ড লেখা এবং প্রচার-জ্ঞাপন শিল্পের সংস্পর্শে এই প্রথমবার দুই বন্ধু বুঝতে পারল যে, তাদের এই শিল্পকর্মের মূল্য যাচাইয়ে বিনামূল্যে সুবিধালাভকারী বুদ্ধিমানদের চাটুপূর্ণ স্ত্রুতিবাদ ছাড়াও অন্যতর মাপকাঠি আছে। এবং সেই মাপকাঠি খুবই বাস্তব। তার পোশাকী নাম টাকা! আর ডাকনাম জীবিকা!

এই প্রথমবার যতীশ আর শিবেশ তাদের কাজের জন্য নিয়মিত অর্থ লাভ করে, জীবিকার্জনের নিশ্চয়তা পেয়ে বিশেষ চরিতার্থতার বোধে উদ্দীপ্তি

অর্জন করল।

আমাদের অপেশাদারিত্বের কর্কশ নখরাঘাতে যতীশ-শিবেশের মতো শতেক লিপিশিল্পী বাংলা তথা ভারতের গ্রাম-শহর-গঞ্জ-বসত এলাকায় প্রতিদিন রক্তাক্ত হয়ে এসেছে! ঐদের কারও নাম শিবুরাম, কারও নাম নিধু লস্কর, কারও নাম শেখ জালালুদ্দিন কামারুদ্দিন, কারও নাম আশিক হুসেইন, কারও নাম ভালি মহম্মদ মীর কুরেশি, কারও নাম অববিন্দভাই পারমার, কারও নাম ফটিক দাস, কারও নাম বিপুল সেনরায়, পিণ্টু বাহার— আবার কেউ সাক্ষাৎ আমাদের সুমন। ঐদের কারও বাড়ি পুরুলিয়ায়, কারও চন্দননগরে, কারও বাস দমদম নাগেরবাজারে, কারও চন্দনগাছির শহর এলাকায়, কারও দেশ খুলনা বা বরিশালে, কারও বা আমেদাবাদে, আর কেউ-বা আমাদের সুমনের মতো গৃহহারা, সবজয়গায় বহিরাগত, সর্বত্র অনুপ্রবেশকারী। ঐরা নামে ভিন্ন, বসবাসে ভিন্ন, কাজেও ভিন্ন। কিন্তু সময়ের আঘাতে সকলে সমানভাবে আহত ও রুধিরলিপ্ত!

যেমন শেখ জালালুদ্দিন কামারুদ্দিন।

আমেদাবাদবাসী সাইনবোর্ড লিখিয়ে জালালুদ্দিন কামারুদ্দিন।

আমেদাবাদের ঘীকান্ত অঞ্চল বস্ত্রশিল্প, গহনা, চামড়ার কাজ, হাতির দাঁতের শিল্পসামগ্রী, পিতলের কাজের জন্য খ্যাত। ঘীকান্তে আরেকটি জিনিস পাওয়া যায়, তা হলো কাঁচি— দর্জির কাঁচি। এখানে কাঁচি বিপণনের জন্য আলাদা পট্টি বা পাড়া আছে। ঘীকান্তে একই রকমের সারি সারি কাঁচির দোকান দেখা যায়। কিন্তু এখানকার অধিকাংশ দোকানই জালালুদ্দিনের আঁকা সাইনবোর্ডের সুবাদে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করেছে। ‘জালালুদ্দিন সাহেবের সাইনবোর্ডের কৃপায় প্রতিটা বিপণী স্বকীয়তায় অনন্য।’ (অথর্ব বনকুদ্রে)

‘ম্যায়নে কভি দো বোর্ড এক জ্যায়সা নহিঁ বনায়।’ অর্থাৎ আমি জীবনে কোনওদিন একরকম দেখতে দুটো বোর্ড বানাইনি— জানিয়েছেন শেখ জালালুদ্দিন কামারুদ্দিন।

শুধু কাঁচি পট্টিতে নয়, ঘীকান্তসহ সমগ্র আমেদাবাদেই শেখ জালালুদ্দিনের

আঁকা প্রচুর বোর্ড নজরে আসবে। বোর্ড ছাড়াও দোকানের শাটার আর দিওয়ার বা দেওয়ালেও তাঁর তুলির কাজ দৃশ্যমান।

মাত্র বিশ বছর বয়সে হরফ শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করে বিগত পঞ্চাশ-বাহান বছর ধরে তিনি এই কাজ করে চলেছেন। মাত্র সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও সাইনবোর্ড আঁকতে আঁকতে তিনি একাধিক ভাষা এবং তার বর্ণমালা আয়ত্ত্ব করেছেন। গুজরাতি, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি ও আরবি— এই পাঁচটি ভাষার বর্ণমালায় জালালুদ্দিন বোর্ড লেখেন।

বস্তুত যে-কোনো বড়ো বা মাঝারি শহরে একাধিক ভাষার হরফ লিখতে পারাটা জরুরি। এটা ঠিকই যে, হরফ লেখাটা বহুলাংশে ছবি আঁকারই মতো। অর্থাৎ হরফের চেহারা দেখে লিখন-শিল্পী সেই হরফের প্রতিলিপি অঙ্কন করেন, কিন্তু সেটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট নয়।

বোর্ড লিখবার কাজে সফলতা অর্জন করতে হলে একাধিক স্থানীয় ভাষায় ও আঞ্চলিক শব্দবন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকটা খুবই দরকার। সেই জ্ঞান থাকায় আমেদাবাদ শহরের বাণিজ্য এলাকায় জালালুদ্দিন সাইনবোর্ড লিখনে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছিলেন।

সুমনের সাইনবোর্ড লেখার শুরুর সময়ে, তখনও যতীশ-শিবেশ তাঁর সঙ্গে এসে ভেড়েনি— এক ভদ্রলোক এসে একটা বিজ্ঞাপন লিখতে দিয়ে গেলেন। ছোটোমাপের টিনের টুকরোর ওপর লিখতে হবে। প্রায় পঁচিশটা বোর্ডের অর্ডার। শুরুর সময়ে বড়ো কাজের বরাতই বলতে হবে।

বেশ খোশমেজাজেই ছিলেন সুমন। বাদল মুষ্টি শব্দ ও দামি টিনের শিট কেটে বানিয়ে দিল ছোটো ছোটো আয়তকার বোর্ড। সেগুলোর জমিতে হালকা ঘিয়ে রং ফলিয়ে শুকোতে দিয়ে গেল। রাত্রিবেলা গোপাল বাড়ুজ্যের আড্ডা থেকে ফিরে বোর্ডগুলোতো হাত দিয়ে দেখলেন রং শুকিয়ে গেছে।

সুমন ভাবলেন— রাতেই দুটো-একটা লিখে ট্রায়াল দিয়ে রাখবেন।

ড্রয়ার থেকে ভদ্রলোকের ম্যাটার লিখে দেওয়া ভাঁজ করা কাগজটা খুলেই চক্ষু চড়কগাছ! সকালে ম্যাটারের আয়তন দেখা ছাড়া অতটা মন দিয়ে

লেখাটা দেখেননি। ভদ্রলোকের হাতের লেখা অত্যন্ত খারাপ। সেখানে লেখা ‘চাষের জমিতে, কিংবা ঘরের কোণে/উইমেকা ধ্বংস করতে দিন/উইমেকা-বিনাশ।’ সঙ্গে টেলিফোন নম্বর।

সুমন ভাবলেন— ‘উইমেকা’টা আবার কী বস্তু? উইপোকা লিখতে গিয়ে উইমেকাটা লেখা হলো নাকি! কিন্তু দু-জায়গায় একই ভুল! বোর্ডে লেখা উঠল মাথায়— এমন সংশয় নিয়ে তো আর লেখা চলে না।

কিন্তু এত রাতে কাকে শুধান? মুস্কিলআসান গোপাল বাড়ুজ্যেকে? তখনও মোবাইল ফোনের মহামারি দেখা দেয়নি। বাড়ির মালিক, অর্থাৎ গোপাল বাড়ুজ্যের শালাকে ডাক দেবেন নাকি! কিন্তু প্রতিদিনের মতো আজও ওদের ঘরের সব আলো বহু আগেই নিভে গেছে।

সুতরাং সারা রাত কাটল অস্বস্তিতে।

সকালেই দম্ভমঞ্জুরত শালাবাবুকে পেলেন কলতলায়।

কাগজটা দেখতেই শালাবাবু বীরেন ভট্টাচার্জ হেসে বললেন, ‘হাতের লেখাটা আমার থেকেও খারাপ। কিন্তু এ তো লিখেছে ঠিকই।’

‘উইমেকা মানে কী?’

বীরেন ভট্টাচার্জ মুখে কিছু বললেন না, তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন পেছনের বাগানে। তর্জনি দিয়ে একটা বড়ো উইটিপি দেখিয়ে বললেন, ‘ঐ যে উইমেকা। আপনাদের কলকেতার ভাষায় কী বলে যেন—’

‘উইটিপি!’ সুমন বুঝলেন ক্লায়েন্ট ভদ্রলোক নিশ্চয়ই উইটিপি ধ্বংস করার কোনো ওষুধ বানিয়ে উইমেকা-বিনাশ নাম দিয়েছেন এবং তার বিপণনের স্বার্থে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

যতীশ আর শিবশেকে পেয়ে এই সমস্যা দূর হয়েছিল। আত্মীয় না হলেও আত্মার মিল কেমনভাবে দুটি জীবনে ফলপ্রসূ হয় তা এই দুই বন্ধুর দেখা না-পেলে সুমনের ভগ্ন-বিশ্বাস কোনোকালে স্বস্তি পেতো কী-না সন্দেহ! নাম-দুটির মিল ছাড়াও মানব-সম্পর্কের অনেকটা আলো পেয়েছিলেন সুমন। সুধাময় আর সালেম ওস্তাগরের বন্ধুত্ব থেকে যেমন, তেমনি এই-দুই

গঞ্জ-বালকের থেকে হৃদকমলের অনেকটা সৌরভ আহরণ করেছিলেন সুমন— হাতেকলমে শিখেওছিলেন অনেককিছু— যা আর্ট কলেজের চার দেয়ালের পরিসরে আঁটে না!

শেখ জালালুদ্দিন দু-তিনটি ভাষা হামেশাই ব্যবহার করেন। সাইনবোর্ড লিখন শিল্পের অধিকাংশ মানুষই স্বশিক্ষিত। শেখ জালালুদ্দিন স্কুলশিক্ষায় ইতি টানার পর ‘দলঘরওয়াড় বাজারে রহিম সাহেবের দোকানে আঁকা শেখার মাঝেই দড়ি বানানো, বই বাঁধাই এবং গ্যারেজ মেকানিক ইত্যাদি নানান কাজে’ নিয়োজিত থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত সাইনবোর্ড আঁকাই তাঁর স্থায়ী পেশা হয়ে দাঁড়ায়। আমেদাবাদের সুপরিচিত সাইনবোর্ড লিখিয়ে হিসেবে শেখ জালালুদ্দিনের পরিচিতি হয় জে কে পেন্টার হিসেবে। রহিম সাহেবের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করলেও অর্ধ-শতাব্দীকাল লেখালেখির সূত্রে তাঁকে স্বশিক্ষিতই বলা যায়।

শেখ জালালুদ্দিনের বড়ো ছেলে প্রথমে বাবার দেখাদেখি সাইনবোর্ড আঁকা শুরু করলেও পরে অন্য পেশা গ্রহণ করেন।

কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাইনবোর্ড-আঁকিয়েরা হরফশিল্পী পিতার উত্তরাধিকার লাভ করেন। যেমন চন্দনগাছির পিন্টু বাহার।

পিন্টুর বাবা শান্তি বাহার ছিলেন চন্দনগাছির শহর এলাকার একমাত্র হরফ শিল্পী। স্থানীয় লোকেদের ডাকে শান্তি পেন্টার। দ্রুত দোকানপাট, ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে চন্দনগাছিকে মিউনিসিপ্যালিটি ঘোষণা করা হয়। তারপর জায়গাটা অধিকতর দ্রুতির সঙ্গে শহরে রূপ পায়। তখন প্রয়োজন-অনুযায়ী আরও জনাকয় পেন্টারের আবির্ভাব হয়। পিন্টু বাহার ছোটোবেলা থেকেই বাপের দোকানে এসে মন দিয়ে হরফ নির্মাণের কলাকৌশল, রংয়ের রহস্যময় মিশ্রণ, তুলির ব্যবহারিক কলাকৌশল, সাইনবোর্ডে শৈল্পিক মোটিফের প্রয়োগ ইত্যাদি লক্ষ্য করত। স্কুল থেকে ফেরার পথে খেলার মাঠে যাবার তাড়া উপেক্ষা করে খিদে-পেটেই বাবার কাজ দেখত ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা। শান্তি পেন্টার চাননি তাঁর ছেলে তাঁর অমন অনিশ্চয়তাময় পেশায় আসুক। তিনি চাইতেন পিন্টু লেখাপড়া শিখে

চাকরি করুক।

লেখাপড়া শিখেছিল পিন্টু। বি. কম. পাশ করেছিল সে। শান্তি পেন্টারের বয়স হয়েছিল, সঙ্গে ছিল ক্রনিক অ্যাঞ্জমা। বাঁশের সিঁড়িতে, অর্থাৎ মইয়ে বা কাঠের ঘরাঞ্চিতে উঠলে পা কাঁপত তাঁর। হরফের রেখা-টানতে গিয়েও মনোযোগের ঘাটতি টের পেতে শুরু করেন শান্তি বাহার। পিন্টু আগে হতেই তুলি, রংয়ের কৌটো, তর্পিন তেল, তুঁতের-গদের-অ্যারারুটের-কাইবিচির-সিন্থেটিক আঠা, নানা ধরনের কাগজের মান-বিচার ও তাদের ব্যবহারের প্রকারভেদ নিয়ে চর্চা শুরু করে দিয়েছিল। দোকানের জন্য কিনে এনেছিল— ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি, বাংলা থেকে বাংলা ও ইংরেজি থেকে ইংরেজি— চারটি ডিকশনারি। পিন্টুর লক্ষ্য ছিল সাইনবোর্ড বা অন্যত্র— যা প্রকাশ্যে প্রদর্শনের জন্য তৈরি তাতে যেন বানান ভুল না থাকে। স্কুলের বাংলা মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গদোষে সে এই মত পোষণ করত যে, ভুল বানানের অবিরল ও নির্লজ্জ ব্যবহার একটি জাতির চরিত্র, স্বাতন্ত্র্যবোধ, রুচি ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করবার পক্ষে যথেষ্ট!

বাপকে মদত দিতে দিতে অবশেষে পিন্টু কবে যেন নিজেই পাকাপাকিভাবে তুলি হাতে তুলে নিয়েছিল। শান্তি পেন্টার বাধা দেননি, বরং ছেলের জন্য গর্ববোধ করেছিলেন।

অবিলম্বে পিন্টু সাইনবোর্ড, দেয়াল, কাগজের পোস্টার, নেমপ্লেট ইত্যাদি



কাঠ বা ধাতুপাতের অক্ষর রিপটি দিয়ে জুড়ে সাইনবোর্ড

সব কাজেই নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে সমগ্র চন্দনগাছিতে একেবারে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু একটা জিনিস পিন্টু কখনও বদলায়নি। তা হলো বাবার ব্যবহৃত সিগনেচার মার্ক! শান্তি পেন্টার তাঁর সমস্ত কাজের নিচে ডানদিকের কোণায় বিশিষ্ট হাতের লেখা বা হ্যান্ড-রাইটিং স্ক্রিপ্টে ‘\*\*এস. বাহার\*\*’ বলে নামসই করতেন। লেখাটা মনোগ্রাম বা এমব্লেম ধরনের ছিল। পিন্টু দোকানের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর, এমন-কী শান্তি পেন্টার লেখালেখি থেকে সম্পূর্ণ অবসর নেওয়ার পরও সে সমস্ত কাজে বাবার নামের পুরোনো এমব্লেমই ব্যবহার করে চলেছে। বন্ধু-বান্ধব এ-নিয়ে প্রশ্ন তুললে সে হেসে বলে থাকে, ‘আরে ভাই, বড়ো বড়ো কোম্পানির মতো ওটা আমাদের এই লিখন কোম্পানির লোগো।’



৩

## নিরঙ্ককার সন্ধ্যায় সুধালাভ

বাবু লালার নাতিকৈ নমস্কার জানিয়ে মানুষটি এক অদ্ভুত কাজে পথে নেমে এলেন।

খান-আষ্টেক দোকানে খোঁজ করার পর, হাটতলার ঠিক আগে একটা পুরোনো, ক্ষয়টে, রাস্তার সঙ্গে লেগে থাকা বাড়ির বহির্ভাগে একটা টেলারিং দোকানে খোঁজ পাওয়া গেল সুধাময়ের।

‘এটা কি রাধাকৃষ্ণ টেলার্স?’

মেশিনের সামনের টুলে বসে থাকা মধ্যবয়সী মানুষটা চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখে রাজ্যের বিস্ময়— ‘এ নাম আপনি জানলেন কী করে?’

‘সুধাময় কি আপনার এখানেই বসে?’

দোকানি বললেন, ‘সুধাময় মানে সুধো? বসে বৈকি! আপনার পরিচয়?’  
পরিচয় দিলেন মানুষটি। সুধাময়ের বন্ধু ছাড়া এখানে তাঁর আর তো কোনো পরিচয় নেই! একটু বিস্মারিত পরিচয়ই দিতে হলো।

‘ওরে বাবা! আমাদের এই গঞ্জের প্রথম ডাক্তারবাবুর ছেলে আপনি!’  
মানুষটি বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করলেন, কণ্ঠস্বরেও শ্বাষাঘাত।

ঘাড় নাড়লেন সুমন।

‘সুধো সবসময় আপনার কথাই বলে। শিল্পী বন্ধু, মানে আপনারে নিয়ে বড্ডাই জাঁক ওর।’ বললেন মিশুকে মানুষটি। জুড়ে দিলেন আলাপ।

সামান্য সময়ের মধ্যেই এই প্রাথমিক পরিচয় আলাপ হয়ে জমে উঠল।

ভদ্রলোকের নাম গোপাল বাড়ুজ্যে, খাস রাঢ়ী বামুন। বললেন, ‘রাধাকৃষ্ণ টেলার্স নামটা আমিই তো ভুলে গিইছি, এখানে বলতি হবে গোপাল বাড়ুজ্যের দোকান। তবে লোকে হৃদিশ দেবে! তা আপনে এ নাম জানলেন কী-করে?’ গোপাল বাড়ুজ্যে বার বার বলতে লাগলেন, ‘একটু বসেন কেনে, সুধোর ভটভটির পুপক রথ এলো বলে!’

সুধাময় একটু পরেই এলো, ভটভটিটা রাস্তার পাশে রেখে দোকানে উঠে এলো।

তাঁকে দেখেও প্রথমটায় সুধাময় বিশ্বাসই করতে পারেনি তার সেই মহার্ঘ বাল্যবন্ধু এতদূরে তার কাছে এসেছে। সে যে কী করবে ভেবে উঠতে পারছিল না। আনন্দের আতিশয্যে শীতল পাটি-বিছানো ঘরের মেঝেতেই খানিক গড়াগড়ি দিয়ে দিল সে। আড্ডাডুরা একে একে এসে পড়ছিলেন।

একটু ধাতস্থ হবার পর সুধাময়ের ব্যবস্থাপনায় চপ এলো, মুড়ি এলো, চা-বিস্কুট এলো।

বন্ধুর এত আপ্যায়নে মানুষটির চোখে জল এলো।

বাবার নিষ্ক্রমণের পর থেকেই তিনি এতকাল ঘরে-সংসারে, ছবি-আঁকিয়েদের গোষ্ঠীতে-লবিত্তে নিজেকে অপাংক্তেয় বলে মনে করে এসেছেন। এমন-কী দাদা বউদিদের চাপে আর বিরাগের ভয়ে মা পর্যন্ত তাঁর শিল্পপাগল ছোটো ছেলের খোঁজ বা যত্ন নিতে পারতেন না। বরং অন্যদের সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতেন যেন।

সংসারে বুদ্ধিবল বা চরিত্রবল অপেক্ষা লোকবল বা অর্থবলের জোর

অনেক বেশি! সাংসারিক বুদ্ধিকে ছাপিয়ে সংসারে বুদ্ধির সংজ্ঞা চালাকি বা ধূর্ত স্বার্থপরতায় লভ্য। জিলিপির প্যাঁচের সঙ্গেই শুধুমাত্র তা তুলনীয়। বন্ধুকে খোঁজার রোমহর্ষক অভিযানের কথা শুনে সকলেই খুব হাসছিলেন। গোপালবাবু বললেন, ‘আরে মশাই, সুধাকে পেতে তো এইটুস কষ্ট করতেই হবে!’

ঐদের ব্যবহারে তাঁরও মুখের আগল খুলে গেল, বললেন, ‘কিন্তু তা-বলে রাখাক্ষণ টেলার্সে বসেও প্রশ্ন করতে হবে আসলে রাখাক্ষণ টেলার্সটা কোথায় বলুন তো! ঘরটায় আবার হাসির গররা দেখা দিল!’

কতদিন একসঙ্গে এত কথা বলেননি! কতদিন এত প্রাণ খুলে হাসেননি সুমন!

গোপালবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, ‘সেটা ঠিক, গোপাল বাডুজ্যের দোকান না বললে পাশের ইলেকট্রিকের দোকানওয়ালা বুধু পর্যন্ত বলতে পারবে না সেটা আবার কোন দোকান। তা আপনে শিল্পী মানুষ, আপনার উপযুক্ত কাজ না-হলেও নিজের লোকের জন্য দিন না ফাঁকিয়ে একটা বোর্ড ‘রাখাক্ষণ টেলার্স’-এর, দিই বাইরে লটকে।’

সুধা তড়িঘড়ি আপত্তি জানালো, ‘বলো কী গোপালদা! সুমন কত বড়ো আর্টিস্ট তা জানো, ও ফুল লতা পাতা, টেবিল চেয়ার আঁকে নাকি! ও কি তোমার সাইনবোর্ড লিখিয়ে!’

সুধাময় যখন গভীর আস্থাভরে তাঁকে ‘কত বড়ো আর্টিস্ট’ বলল তখন সুমনের মনে হলো শুনলেন ‘বড়ো আর্টিস্ট নয়’ সুধাময় তাঁকে বলছে ‘কত হেরো আর্টিস্ট’— তাঁর প্রকৃত হাল যদি সুধা জানতো!’

সুমন তাড়াতাড়ি গোপাল বাডুজ্যেকে বললেন, ‘তা কেন! অন্ত গর্ব আর নেই। যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে— আমি কখনও সাইনবোর্ড লিখিনি, কিন্তু আপনারটা দিয়েই চেষ্টা করে দেখতে পারি।’

বন্ধুরা বললেন, ‘এখানে তো কেউ সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপনের ধার ধারে

না, দিন লিখে। আমাদের রাধাকিষ্ট টেলার্সের নাম এই মাঠেল অঞ্চলে একেবারে ফেটে যাবে!’

রাত্রে সুধাময়ের তিন কামরার বাড়ির বাইরের দিকের ঘরের চৌকিতে দুই বন্ধুর আড্ডায়-শয়নে সুমনের কলকাতা জীবনের সব কথা শুনে সুধাময় বলল, ‘তায় আর কী, তোর তো কোনো পাছুটানই রইল না। তুই এখানেই’র না-কেনে। কিছু-মিছু কর, আর নিজির মন-মতো ছবি আঁক। ইচ্ছে মতন হাত-পা-ছড়িয়ে বাঁচ। হিসেব মতন দেখতে গেলে আমাদের বয়েসও তো কম হলো না। দুই বন্ধু জড়ান-প্যাঁচান দিয়ি থাকি।’

সুধার কথার স্পষ্টতাও যেন সুমনের কাছে ঘোর হয়ে দেখা দিল— এমন হয় নাকি! এই কলিকালে!

দিন-কয়েক পর থেকেই অদ্ভুত এক যাত্রা শুরু হলো সুমনের।

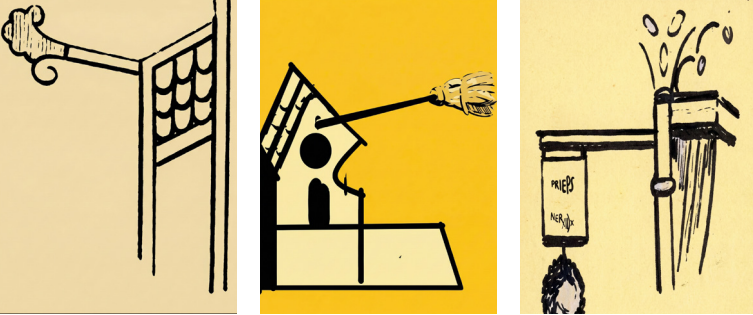
দু-দিন আগেও এমন জীবনের কোনো প্রকল্পনা তাঁর নিরালম্ব-শূন্যতায় বেপথু হাওয়া হয়েও প্রবেশ করেনি।

১৩

### মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

সাইনেজ, প্রতীক এবং জ্ঞাপনীচিহ্নের ব্যবহারিক প্রয়োগের ঐতিহ্যগত অনুক্রমিক অনবচ্ছিন্নতার সূত্রে এবং নগরজীবনের বিস্তৃতি, সমুদ্র-বাণিজ্যের অভিযাত্রা, ক্রমাগত নতুন নতুন ভূবিশ্বের পরিচয় উন্মোচনের ফলে বিশ্বব্যাপী বিপণনের প্রসারণ এতটাই ব্যাপকতা লাভ করে যে, বিপণি কিংবা যাবতীয় পণ্যের জন্য অথবা সবধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সাইন এবং তদসূত্রে সাইনবোর্ডের ব্যবহার আবশ্যিক বলে বিবেচিত হতে থাকে। বিশেষভাবে ইউরোপের উপনিবেশকুশল ও বাণিজ্যসফল দেশগুলিতে।

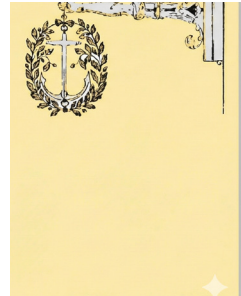
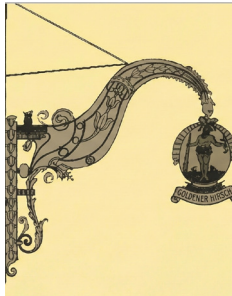
খুব প্রাথমিক যুগেই সম্ভবত কর আদায়ের সুবিধার জন্য বহু ক্ষেত্রে



পানশালার বাইরে ঝোপের সাইনেজ, একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

সাইনবোর্ড লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল [‘ট্যাভার্নিকিপারস্ মাস্ট পুট আপ সাইনবোর্ডস্ অ্যান্ড এ বুশ (পানশালার সর্বজনমান্য প্রতীক)... নোবডি শ্যাল বি অ্যালাউড টু ওপেন এ ট্যাভার্ন ইন দি সেইড সিটি অ্যান্ড ইটস্ সুপার্বস্ উইদাউট এ সাইন অ্যান্ড এ বুশ’]। স্বাভাবিক সাইনবোর্ড না-লাগানোর জন্য ১৩৯৩ সালে চেলসিয়ার একজন মদ্যব্যবসায়ীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। কেমব্রিজেও এ-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন বেশ কঠোর ছিল। (লারউড ও হটেন: প্রাপ্তুক্ত গ্রন্থ)

ইংলন্ডে প্রথম চার্লস (১৬০০-১৬৪৯) সিংহাসনে আরোহনের পরে পানশালা ছাড়াও লন্ডনের আপামর ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের পরিচয়জ্ঞাপক ও নির্দেশক সাইনবোর্ড ঝোলানোর মঞ্জুরি প্রদান করেন। এই শহরের নাগরিকদের এবং তাদের যে কোনও ব্যক্তির জন্য, শহর ও শহরতলির রাস্তা, সড়ক এবং গলিতে, তাদের বাড়ি এবং দোকানে লাগানো, একই ধরনের সাইনবোর্ড এবং পোস্ট খোলা এবং ঝুলানো বৈধ হবে, যাতে এই ধরনের নাগরিকদের বাসস্থান, শিল্প, বা পেশা, তার উত্তরাধিকারীদের কোনোরকম হয়রানি বা বাধা ছাড়াই আরও ভালোভাবে শনাক্ত করা যায়। ফ্রান্সে পানশালা ও সরাইখানার মালিকরা ইংল্যান্ডের মতোই রাষ্ট্রীয় নিয়মের অধীনে ছিলেন; কারণ সেখানেও, ১৫৬৭ সালের এক আদেশ অনুসারে, সমস্ত সরাইখানার মালিকদের ম্যাজিস্ট্রেটদের তাদের ‘নাম এবং ঠিকানা’ এবং তাদের ‘প্রভাব ও লক্ষণ’ সম্পর্কে অবহিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় হেনরি (১৫৫১-১৫৮৯) ১৫৭৭ সালের মার্চের



একটি ঘোষণা-অনুসারে, সমস্ত সরাইখানার মালিকদের তাদের বাড়ির সবচেয়ে স্পষ্ট অংশে একটি চিহ্ন স্থাপন করার আদেশ দেন— যাতে প্রত্যেকে, এমনকি যারা পড়তে পারে না, তারাও পানাগারের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকে। চতুর্দশ লুই (১৬৩৮-১৭১৫) বা লুই দ্য গ্রেট, ১৬৯৩ সালে জারি করা একটি আদেশ অনুসারে, প্যারিস তথা ফ্রান্সের সাইনবোর্ড প্রতিস্থাপনের নির্দেশ দেন এবং জানান যে, অতঃপর সরাইখানা মালিকেরা সাইনবোর্ড এবং বিক্রয়যোগ্য পণ্যের দামের তালিকা উল্লেখ না করে সরাইখানা চালাতে পারবেন না। নিয়ম না মানলে এই আইনে লাইসেন্স রদ করা ও সরাইখানা বন্ধ করে দেবার সংস্থান ছিল।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে লন্ডনের মতো বৃহৎ ও জনবহুল নগরের সমস্ত পথঘাট ব্যবসায়িক বিপণি, বিবিধ প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাগানো সাইনবোর্ড, প্রতীকী-জ্ঞাপন ও পরিচয়লিপিতে ভরে যায়। এর একটা বড়ো অংশই ছিল পানশালা এবং সরাইখানা। বস্তুত সাইনবোর্ড ও বিজ্ঞাপনের আধিক্যের ফলে শহরের রাস্তাঘাট ঢেকে যায়, আকাশ যায় দৃষ্টিসীমার অন্তরালে। সে যেন সাক্ষাৎ এ-কালের কবির অনার্ত আক্ষেপ— ‘একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি/তোমার জন্য গলির কোণে/ভাবি আমার মুখ দেখাব/মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’। (শঙ্খ ঘোষ: মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে, ১৯৮৪)

লন্ডনের মহা অগ্নিকাণ্ড ঘটে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে। এক বেকারির চুল্লি থেকে আগুন ছড়ায়। বেকারিটা ছিল বিখ্যাত লন্ডন ব্রিজের কাছেই। ২ সেপ্টেম্বর আগুন লাগে। ৬ সেপ্টেম্বর অগ্নি তার রোষ সংবরণ করে। এই বিধ্বংসী আগুনে প্রায় সাড়ে তেরো হাজার বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়, গৃহহারা হন লক্ষাধিক মানুষ। ওল্ড সেন্ট পল্’স ক্যাথেড্রালসহ সাতাশটি চার্চও ধ্বংস হয়। যেমন আদালত, জেল, বেসামরিক প্রশাসনিক ভবন, শহরের অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সরকারী হিসাবেই এক ডজনরও বেশিজনের প্রাণহানি হয়েছিল। অনুমান সমগ্র লন্ডন শহরের

৮০ শতাংশেরও বেশি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে সম্ভবত কাঠের তৈরি সংখ্যাতিত সাইনবোর্ড চমৎকার দাহ্য পদার্থ হিসেবে কাজ করেছিল। ফলে অগ্নিকাণ্ড পরবর্তীকালে লন্ডন শহরের পুনর্নির্মাণের পর রাস্তায় কাঠের সাইনবোর্ডের পরিবর্তে, পাথরে খোদাই করা এবং সাধারণত অক্ষরগুলি রঙ করা বা সোনালি রঙ করা সাইনবোর্ড ব্যবহার করা হতো, যা বাড়ির সামনে এবং প্রথম তলার জানালার নিচে রাখা হতো কিন্তু আগুনের আয়ত্তসীমার বাইরে থাকা লন্ডনের রাস্তাগুলির সাইনবোর্ড তার পুরোনো চালই বজায় রেখে চলতে থাকে। সেখানে আগেকার মতোই কয়েক ইঞ্চি দূরে দূরে কাঠের পাটাতনের ওপর লেখা সাইনবোর্ড শোভা পেতে থাকে। ফলস্বরূপ, সরু রাস্তায়, ঘিঞ্জি এলাকায় পেন্টহাউস এবং সাইনবোর্ডের কারণে লন্ডনের রাস্তায় ভাগ্যহীন পথচারীদের কাছ থেকে আকাশের দৃশ্যমানতা, বাতাসের ক্রীড়াকুশলতা এবং পথসঙ্কানের আলো প্রায় আটকে যায়। সেখানে পথচারীদের পাওনা— বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট বা পেন্টহাউজগুলি থেকে উড়ে আসা ফুলের টব, কিংবা প্রতিটি বাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে আসা বরনা-স্নানের জলধারা এবং মরচে-লাগা কজায় জলস্রোতের বুলন্ত চিহ্নগুলি।

এই অসহ্য পরিস্থিতি থেকে লন্ডনের পথচারীদের কিছুটা মুক্তি দিয়েছিলেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস (১৬৩০-১৬৮৫)। তাঁর ইংলন্ড শাসনের সপ্তম বছরে, অর্থাৎ ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে লন্ডন শহরের পুনর্নির্মাণের জন্য আইনটি পাস হয়েছিল। এতে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে ভবিষ্যতে আগুনের ঝুঁকির বিরুদ্ধে সমস্ত নতুন ভবন ইট বা পাথর দিয়ে তৈরি করতে হবে। এই আইনে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, কোনো রাস্তায় আড়াআড়ি কোনোরকম সাইনবোর্ড লাগানো চলবে না। তবে বাড়ির বারান্দায় বা বাড়ির পাশে কোনো সুবিধাজনক জায়গায় সাইনবোর্ড লাগানো যেতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারিসবাসীরাও এই ভয়াবহতার শিকার

হচ্ছিলেন। কাষ্ঠসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বনরক্ষা ও বনায়নের লক্ষ্যে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে জারি-করা ফ্রান্সের রাজকীয় অধ্যাদেশের (পূর্বোক্ত ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই) দ্বারা রাস্তার যত্রতত্র দানবিক সাইনেজ ও সাইনবোর্ড লাগানোয় নিষিদ্ধকরণ করে জারি করা অর্ডিন্যান্সের বিলক্ষণ সম্বন্ধ অনুমান করা যায় [ইন ১৬৬৯, এ রয়্যাল অর্ডার ওয়াজ ইস্যুড টু প্রহিবিট দিজ মনস্টারাস সাইনস্, অ্যান্ড দি প্র্যাকটিস অব অ্যাডভান্সিং দেম টু ফার ইনটু দি স্ট্রীটস্, “হুইচ মেড দি থার্যাফেয়ারস্ ক্লোজ ইন ডে-টাইম, অ্যান্ড প্রিভেন্টেড দি লাইটস্ অব দি ল্যাম্পস্ ফ্রম স্প্রেডিং প্রপারলি অ্যাট নাইট”। (লোরউড ও হটেন)] লন্ডনেও প্রায় একই সময়ে কিছুটা অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। স্পষ্টতই তখন ব্যবহৃত সাইনবোর্ডগুলির আমাদের পোস্টারের মতো, একটি আকর্ষণ ছিল, তবে অতিরিক্তভাবে যানবাহনের জন্য একটি বড়ো ঝামেলা এবং প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের জন্য একটি বিপদ ছিল।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই সমস্যা আরও তীব্র হয় বলে মনে হয়। ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুই (১৭১০-১৭৭৪) তাঁর রাজত্বকালে (১৭১৫?-১৭৭৪) সাইনবোর্ডের উৎপাত হ্রাস করার জন্য ১৭৬১ সালে একটি আদেশ জারি করেন। এতে সাইনবোর্ডগুলিকে কেবলমাত্র দেওয়ালের সঙ্গে সমতলভাবে ঝোলানোর অনুমতি প্রদান করা হয়। (ই. ম্যাকনাইট কাউফার: ১৯২৪)

মধ্য ও উত্তর-মধ্যযুগের থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত ইউরোপীয় জীবনধারায় মাদকতাময় চলনরীতির উপস্থিতির ফলে পানাগার, বিয়ার-জাতীয় পানীয় তৈরিতে দক্ষ পরিবারগুলির উদ্যোগ, অজস্র সরাইখানায় প্রতীকী জ্ঞাপনী তথা সাইনের প্রদর্শনের বৈচিত্র্য এবং তৎসহ পণ্য বিপণনের মাধ্যম হিসেবে আকর্ষণীয় বিষয় আর তার ইঙ্গিতপূর্ণ উপস্থাপনায় লিখন ও সাইনের ব্যবহার সর্বকালে অন্যতর অধ্যয়নের বিষয় হতে পারে। যেমন: পানশালার জন্য বুশ বা ঝোপ ছাড়াও আঙুরগুচ্ছ, নাগ’স্ হেড, অ্যাগে

পোল ইত্যাদি প্রতীক— ধার্মিক, অর্থশালী, ক্ষমতাবান ও অভিজাত পরিবারের চিহ্ন হিসেবে লুট্রেল সাল্টার। অ্যাঁলে পোল বা অ্যাঁলে স্টেক ছিল ইউরোপে ব্যবহৃত এমন একটি প্রাথমিক চিহ্ন, যার দ্বারা বোঝানো হতো— একটি পরিবার নতুনভাবে অ্যাঁলে বা বিয়ারের একটি নতুন পাতন বা নতুন ব্যাচ তৈরি করেছে। সে-সময় সমস্ত বিয়ার তৈরি হতো ঘরোয়া ক্ষেত্রে। কিন্তু যে-সকল বাড়ি বা পরিবার উৎকৃষ্ট মানের বিয়ারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল, তাঁরা নিজেদের ‘অ্যাঁলে হাউজ’-এ গ্রামের মানুষজন, পথচারী বা পর্যটকদের বিয়ার পানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

নাগস্ হেড ছিল একটি ঘোড়ার মুখ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘোড়ার লোহার নালসহ), গ্রেট ব্রিটেনের পাব বা পানশালাগুলির একটি জনপ্রিয় নাম বা অভিধা।

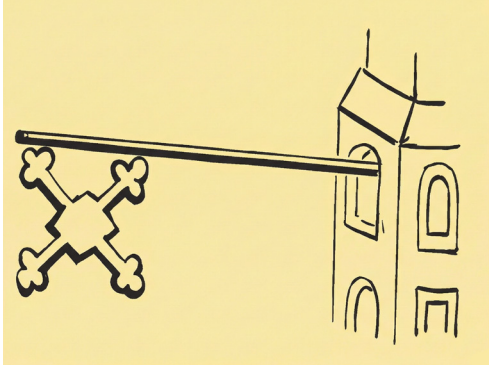
অপরদিকে ক্রশ চিহ্নের আড়ালে থাকা লুট্রেল সাল্টার হলো লিঙ্কনশায়ারের ইরনহ্যামের জমিদার স্যার জিওফ্রে লুট্রেল (১২৭৬-১৩৪৫) দ্বারা কমিশনড একটি আলোকময় সাল্টার (বাইবেলের প্রার্থনাসংগীতের গ্রন্থ), যা ১৩২০ সাল থেকে ১৩৪০ সালের সময়সীমার মধ্যে ইংলন্ডের বেনামী লেখক ও শিল্পীদের দ্বারা পার্চমেন্টে লিখিত ও চিত্রিত হয়েছিল। এই পাণ্ডুলিপি ছিল লুট্রেল পরিবারের মর্যাদা, আভিজাত্য, সম্পদ এবং রুচির পরিচয়। পরে



নাগ'স হেড



অ্যালো পোল বা অ্যালো স্টেক



ক্রশ বা লুট্রেল সাল্টার

সংশ্লিষ্ট প্রতীকটি সম্ভবত সার্বিকভাবে ধার্মিক ও রুচিলালিত গ্রামীণ আদর্শ জীবনযাত্রাবোধের পরিচয় হয়ে ওঠে।

সেই সময়ের প্রতীকী চিত্রগুলি সাধারণভাবে বাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকা দন্ডের সঙ্গে পতাকা বা একপক্ষবিশিষ্ট ব্যানারের মতো বুলন্ত অবস্থায় প্রদর্শিত হতো।

১৭৩৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সকালে লন্ডনের পানশালাগুলি গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়। কেননা সম্ভবত ঐদিনই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রণীত ‘দি স্পিরিট ডিউটিজ অ্যাক্ট ১৭৩৫’ চালু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দশকগুলিতে জিন (শস্য-থেকে পাতিত স্পিরিটের জন্য একটি সাধারণ শব্দ) পানের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরাধপ্রবণতা, অসুস্থতাসহ নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। বস্তুত জিন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই মদের ওপর চড়াহারে কর চাপানো হয়। এই নয়া আইনে প্রতি গ্যালনে খুচরা বিক্রয়ের উপর ২০ শিলিং হারে কর আরোপ করা হয়েছিল এবং লাইসেন্সধারীদের জিন বিক্রির জন্য বার্ষিক ৫০ পাউন্ড লাইসেন্স নিতে হয়েছিল, যা বর্তমানে প্রায় ৮,০০০ পাউন্ডের সমান। কিন্তু প্রথম থেকেই এই আইন ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হতে থাকে। এইসময় অপরিবর্তিত সাইনবোর্ডের উৎপাত কিছুটা কমেছিল বলে মনে হয়।

কিন্তু সমস্যার হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ জানা না গেলেও, এই আইনের ফলে নাগরিকদের ক্ষোভ ও মদ্যকারদের কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই আইন প্রণয়নের পনেরো বছর পর ব্রিটিশ চিত্রকর উইলিয়াম হোগার্থ ‘জিন লেন’ ও আমাদের পূর্বোক্ত ‘বিয়ার স্ট্রীট’ নামে দুটি ছবি প্রস্তুত করেন। আমরা চিত্রকলা বা ইতিহাস বিশেষজ্ঞ নই। ভ্রান্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের ধারণা— ছবি দুটিকে সরলার্থে পরস্পর বিপরীত বলে মনে করা যেতে পারে। হোগার্থ ‘জিন লেন’ ছবিতে জিন পানে আসক্ত নগরজীবনের অসংবৃত্ত নাগর-ত্রিয়ার অবিরল বীভৎসাকে চিত্রিত করেছেন। বিদেশী জিনের প্রভাবে মত্ত জনসমাজের নিষ্ঠুরতা, শিশুহত্যা, একই চত্বরে একাধিক সাইন ঝোলানো পানশালা, উচ্ছৃঙ্খলার সঙ্গে চারদিকে ধ্বংসের ছবি। অপরদিকে ‘বিয়ার স্ট্রীট’-এর বাসিন্দাদের কিছুটা সুস্থ এবং সুবিন্যস্ত জীবনের প্রতিভূ হিসেবে ঐকেছেন হোগার্থ। স্থানীয় ও ঘরোয়াভাবে তৈরি ছোটো বিয়ার এবং অ্যালসেবিত তথাকথিত সুখী লোকেরা ‘বিয়ার স্ট্রীট’-এর বাসিন্দা। ‘জিন লেন’-এর উন্মত্ত বৈশিষ্ট্য আর ‘বিয়ার স্ট্রীট’-এ স্থূল লোকেদের মতোই মোটা দাগের জীবনযাপন (মাছের বাজার!)। বিনাশ ও তথাকথিত উজ্জীবনের বৈপরীত্যের



‘জিন লেন’, উইলিয়াম হোগার্থ অঙ্কিত



উইলিয়াম হোগার্থ অঙ্কিত ‘বিয়ার স্ট্রীট’

মধ্যে সম্ভবত একটাই মিল, আর তা হলো মদালস জীবনের স্থূলতা, অন্তঃসারশূন্যতা। ইতোপূর্বেই আমরা বলেছি যে, শেষোক্ত চিত্রে সাইন অঙ্কনরত নির্মদে শিল্পীর উপস্থিতির সূত্রে সাইনবোর্ড আঁকিয়ে হিসেবে শিল্পী হোগার্খের আত্মবোধের একটু বাড়তি অথচ জরুরি ভূমিকা থেকে যায়।

বস্তুত শুধু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ইংলন্ড, ফ্রান্স বা ইউরোপ নয়, কলোনী ভারতেও বাজারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাপনীর বাড়াবাড়ি রকমের ব্যবহার হতে থাকে। সাইনবোর্ডের ঘনঘটার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের লন্ডন অথবা ব্রিটিশ ভারতের নগরকেন্দ্রগুলির বা বিশ শতকের প্রথমার্ধের রাজপথগুলির বিশেষ কোনো ফারাক খুঁজে পাওয়া মুশকিল।



পুরোনো কলকাতার চৌরঙ্গী এলাকার  
দোকানপাটে সাইনবোর্ডের বাহুল্য



পুরোনো লন্ডনে  
সাইনেজের বাড়াবাড়ি

আমরা আগেই দেখেছি যে, শুধু ভারতে নয়, সমগ্র প্রাচ্যেই সাধারণভাবে ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে বিপণি পরিচয়ের তেমন প্রয়োজন হতো না, কেননা জনভুক্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই অক্ষর পরিচয়ের বিশেষ ধার ধারত না। তারও ওপর পণ্য-অনুযায়ী বিক্রয়-এলাকা এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের পছন্দ এতই সুনির্দিষ্ট এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এতই অব্যবহিত ছিল যে সাইনবোর্ড বা সাইনেজ-ব্যবহার করার প্রসঙ্গই ছিল না। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এবং তার পরেরও কলকাতার ছবি

ও স্কেচগুলিতে ক্রেতা-বিক্রেতায় ভিড়াক্রান্ত বাজারে বিপণির সংখ্যা অগণন হলেও সেখানে বিপণির স্থায়ী কাঠামোর সংখ্যা কম এবং তা জ্ঞাপনীবিরল। সেকালের বিকিকিনির পদ্ধতির ধরনটি বোঝা যায় সেকালের গ্রন্থে। হতোম তাঁর নকশায় লেখেন: ‘যে সকল মহাত্মারা ছেলে-বেলা কলকেতার চীনে বাজারে “কম স্যার! গুড সপ স্যার! টেক্ টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ একবার তো সী!” বলে সমস্ত দিন চীৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা...’ (হতোম প্যাঁচার নকশা: ১৮৬৪) হতোম বিচিত্র অর্থে ও বিচিত্রতর ব্যঞ্জনায় বাজার শব্দটি ব্যবহার করেছেন।



বেলজিয়ান শিল্পী ফ্রাঁস বালথাজার সলভিস (১৭৬০-১৮২৪) অঙ্কিত কলকাতার বাজার।  
স্থায়ী কাঠামো বিরল, সাইনবোর্ডহীন। খোলা বিপণিতে বিকিকিনি। ১৮১১ সাল।

কিন্তু সম্ভবত এই সময়কালেই ইংরেজদের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি বা মার্চেন্ট হৌসের শিরোদেশে ইংরেজি ভাষায় পরিচয়-জ্ঞাপনী লাগানো শুরু হয়ে গেছে। বস্তুত বাঙালির ব্যবসার ধারাবাহিকতার শুরু হয় আরও কিছু পরে— একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বা বিংশ শতাব্দীর সূচনায়। ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ আখ্যায়িকায় ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন:

‘বাঙালীরা কারবার জানেনা, কেবল চাকরী জানে, এই একটা দুর্নাম ছিল; এখন সেই দুর্নামমোচনের অভিলাষে বাঙালী সন্তানেরা এক একটা কারবারের নামে এক একটা দোকান খুলে বোসছেন, দোকানে দোকানে এক এক সাইনবোর্ড বুলছে। সব সাইনবোর্ডে প্রায় দোকানদারের নামের সঙ্গে “এণ্ড কোং” জোড়া। (উদ্ধৃত এবং বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আত্মজিৎ মুখোপাধ্যায়: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২: ইনস্ক্রিপ্ট.মি) বাঙালীরা কোম্পানীবদ্ধ হয়ে কাজ কোত্তে জানেন, ঐ এণ্ড কোং শব্দ তারি পরিচয় দেয়, ফলে কিন্তু কি সেটি নির্ণয় করা দুর্ঘট। অক্ষরেই কেবল এণ্ড কোং, এণ্ড কোং, এণ্ড কোং!’

কী কী কারবারে বাঙালির মধ্যে বাণিজ্যে বসতে... জেগে উঠেছিল তা-ও জানিয়েছেন ভূবনচন্দ্র: ‘কতদিকে কত প্রকারে ইংরেজী সভ্যতার নিদর্শন দৃষ্ট হয়, সংখ্যা করা যায় না। দেশের পূর্বে গৌরবের উদ্ধারবাসনায় কেহ কেহ অগ্রসর। মধ্যে কয়েক বৎসর আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল, এখন আবার কতকগুলি লোক— বৈদ্যই হ’উন আর অন্য জাতিই হ’উন, আয়ুর্বেদকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন, রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় সাইনবোর্ডে “আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়” অগণিত।’ (ভূবনচন্দ্র: হরিদাসের গুপ্তকথা)



উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা। সাইনবোর্ডবিরল এবং ইংরেজি হরফে মুষ্টিমেয় সাইনবোর্ড দৃশ্যমান।



উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতায় সাইনবোর্ডবিহীন দোকানপাটের সারি।  
শুধুমাত্র ইংরেজি সাইনবোর্ড-সংবলিত মুষ্টিমেয় বিপণি।

এসব ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে সুমন ১৯৪০-এর দশকের কলকাতার একটি ছবি পেলেন। হ্যারিসন স্ট্রীট (বড়োবাজার) ও স্ট্র্যান্ড রোডের সংযোগস্থলের এই ছবিটিতে ভুবনচন্দ্রের কথার সারবত্তা বুঝতে পারলেন সুমন। ছবিতে ঐ দুই রাস্তার সংযোগস্থলের স্থাপনার অঙ্গে, তার আশপাশের অট্টালিকায়, এবং রাস্তায় ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্মাসী, বেঙ্গল শর্টা ফুড, অজস্র আয়ুর্বেদিক সংস্থার, চিকিৎসাগ্রন্থের, ভীমরস সালসা, দুলালের তালমিছরি, গোবিন্দ সুধা, কুমারেশ, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পুস্তক, হেমকান্তি সুরভিত কেশতৈল, সান বিস্কুট ও বার্লি, হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং ইত্যাকার ওয়ুধ-বই-প্রসাধনীর সাইনবোর্ড!

সাইনবোর্ড শিল্পের আর-একটি প্রেক্ষিতের দিকেও সুমনের নজর পড়ে। তা হলো স্ট্রীটনেম সাইন বা পথপরিচায়ক পথলিপি। মুখ্যত নগরজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই লিপিচিত্র কলকাতায় থাকতে চোখের সামনে আকছাড় দেখেছেন। অনেকসময় চমকিতও হয়েছেন। কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করতে পারেননি। অনতি-বাল্যে স্মরণকালে যখন গঞ্জ থেকে তাঁর বাবা



বাংলা ভাষায় লেখা সাইনবোর্ডের সমারোহ। কলকাতা, ১৯৪০-১৯৪৫।

বদলি হলেন, তখন বর্ধমানের মতো মফস্বলী শহর ছুঁয়ে তাদের পরিবার একেবারে মহানগরে! ততদিনে সুমন কৈশোর ছুঁয়েছেন।

নতুন ক্লাস, নতুন স্কুল। মায়ের সঙ্গে বই-খাতা কিনতে বেরিয়েছেন।

ডাক্তার হলেও হাসপাতাল বা সরকারি ডিসপেন্সারিতে চাকরির অতিরিক্ত উপার্জনে বাবার অনীহার কারণে মাকে খুব সন্তর্পণে সংসার চালাতে হতো। বরাবরই দিস্তা ধরে সাদা আর রুল-টানা লেখার কাগজ কিনে ক্রচেটের সুতো আর গুণসূঁচ দিয়ে সেলাই করে তাতে ব্রাউন পেপারের মলাট দিয়ে দিতেন মা।



• বাবুডাঙা বাই লেন •

দেয়াল থেকে প্রায়-ঝুলন্ত ছুটকো দোকান থেকে কাগজ কিনে একসার দোকানের মাঝের রাস্তা দিয়ে সুমনকে নিয়ে একটি তস্য গলিপথে প্রবেশ করলেন মা। সেটার

প্রথম বাড়িটার পলেস্তারা-খসা বিবর্ণ দেয়ালে সরু একফালি ব্লু এনামেল বোর্ডে সাদায় লেখা রাস্তার নাম পড়ে চমকে গেছিলেন সেদিনের সদ্য-কিশোর সুমন। এই নাম তো তিনি তাঁর বাল্যাবধি গজানো সাহিত্যপ্ৰীতির সুবাদে কতই পড়েছেন গল্পে! সুমন দেখলেন গলির শেষবাড়িটার গায়েও অমন পরিচয়জ্ঞাপক প্লেট লাগানো। আরও পরে মহল্লার আশপাশে এমন অনেক স্ট্রীটনেম-সাইন দেখেছেন, পুরোনো পাড়াগুলির বাড়ির নম্বরও অনেক ক্ষেত্রে এনামেল কাস্টিংয়ে লেখা থাকত।

এই নামলিপি মুখ্যত নগরায়ণের দান।

প্রতীচ্যে, বিশেষভাবে ইংলন্ডে আধুনিক অর্থে নগরায়ণের প্রক্রিয়া গতি অর্জন করে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে, এবং শিল্পবিপ্লবের কালে তা দ্রুতি পায়। উনিশ শতকের আগেও সেখানে নগরায়ণ ঘটেছে কিন্তু তা ধীর অথচ স্থিত গতিতে। শিল্পবিপ্লবের ফলে রাজধানীকেন্দ্রিক জীবিকাবন্টন এবং নতুন নতুন শিল্পশহর গড়ে ওঠার সুবাদে মানুষ বেশি-সংখ্যায় লন্ডন ও অন্যান্য শহরে ভিড় করতে শুরু করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে এই পরিযানের হার ছিল অনেক বেশি। শহরগুলির পশ্চাদ্ভূমি এবং সংলগ্ন এলাকা বা শহরতলির বিস্তারের ফলে পল্লী ও রাস্তাঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে— শহরগুলির বসতি এক সংকীর্ণ ও জটিল চেহারা গ্রহণ করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০)-এর অলিভার টুইস্ট সেই সময়কার লন্ডনের ‘বাণিজ্যিক উপনিবেশ’-এর ভিতর মহলের যে ছবি (‘এখানে, পুরোনো লোহা এবং হাড়ের ভাণ্ডার, এবং পশমী জিনিসপত্র এবং লিনেনের টুকরোর ছাইয়ের স্তুপ, ময়লার গর্তে মরিচা-নোংরা এবং পচন’ অথবা ‘যদিও অলিভার তার নেতার দিকে নজর রাখার জন্য যথেষ্ট মনোযোগী ছিল, তবুও সে পথের দুপাশে তাড়াছড়ো করে একবার তাকিয়ে থাকতে পারল না। আরও নোংরা বা আরও জঘন্য জায়গা যা সে কখনও দেখেনি। রাস্তাটি ছিল খুবই সরু এবং কর্দমাক্ত, এবং বাতাস ভরে গিয়েছিল কটু দুর্গন্ধে’: ভাবানুবাদ) তুলে

ধরেছে তা বোঝা যায়। সেই সময় ব্রিটেনের শহরগুলিতে শিল্পশ্রমিকেরা যেভাবে বাস করতেন তার বিবরণ থেকেও ব্রিটিশ নগরায়ণের একটা ছবি পাওয়া যায়। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) তাঁর ‘১৮৪৪ সালে ইংলন্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা’ রচনায় স্পষ্ট করে জানিয়েছেন সেই ১৮৪০-এর দশকে দ্রুত নগরায়ণের ফলে অস্বাস্থ্য, বসবাসের অনুপযুক্ত কুৎসিত অবস্থা ছাড়াও এই শহরগুলিতে অনিয়মিত আকারের জমি এবং বাসস্থানের মধ্যে সরু হাঁটার পথ ছিল। কোনও স্যানিটারি সুবিধা ছিল না। জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি ছিল। (১৮৮৭ সং)

এইরকম নগরায়ণের ব্যবস্থায় প্রচুর পথ বা বিপথের সৃষ্টি হয়। সম্ভবত এবং পূর্বতন ও সাম্প্রতিক আকারে বিস্তৃত, প্রকারে জনাকীর্ণ এবং সম্প্রসারিত শহর আর তার অগণন রাস্তার জন্য নামফলকের প্রয়োজন দেখা দেয়। দরকার হয় নব নব উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য এবং অজস্র বিপণির জন্য জগপনীর। ফলে পথলিপি ও সাইনবোর্ডের ব্যবহার নতুন মাত্রা লাভ করে। আমেরিকায় নগরায়ণের মাত্রা আশি শতাংশের বেশি। সেখানকার নিউ ইয়র্কের মতো সুবৃহৎ শহরের রাস্তাঘাটের সংখ্যা ও তার জগপনীর ব্যবহারও তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট পরিকল্পিত।

উপনিবেশের দেশ হিসেবে আমাদের দেশেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দ্বিতীয় পর্ব থেকে উনিশ শতকে নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে শহরের পল্লীগুলির রাস্তাঘাটের অবস্থার পরিবর্তন হয়। নিজেদের প্রয়োজনেই নগরায়ণের ধারায় ভারতীয় মেট্রোপলিসগুলি ক্রমশ রূপ পেতে থাকে। বাণিজ্য ও বন্দর নগরী এবং শিক্ষা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার আত্মপ্রতিষ্ঠা, জীবিকার সন্ধানে বহুমানুষের কলকাতা আগমন, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে কলকাতার গুরুত্ব ও জনঘনত্বের ফলে কলকাতাতেও রাস্তাঘাটসমেত সাবেক পল্লীগুলির পরিচয়জগপনীর প্রয়োজন দেখা দেয়। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বঙ্গের পুরোনো নগরকেন্দ্রগুলি ছাড়াও ইউরোপীয় ঠাঁচে মুখ্যত গঙ্গা-অববাহিকায় নগরায়ণের গতি দ্রুতি

লাভ করে। কলকাতার বহু আগেই বঙ্গের নগরকেন্দ্রগুলিতে দেখা দেয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনে গঠিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা লোকাল গভর্নমেন্ট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটের পরিচয়জ্ঞাপনী বেশ সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপধারণ করে। এ ব্যাপারে লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, কলকাতা, দিল্লি, নিউ ইয়র্ক বা অপরাপর বড়ো বড়ো শহরগুলির মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগোলিক অবস্থানগত বাস্তবতার (নিউ ইয়র্ক বা লন্ডনের জনঘনত্বের তুলনায় কলকাতার জনঘনত্ব অনেক বেশি; এবং ঐ দুই শহরের তুলনায় কলকাতায় রাস্তাঘাটের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম) যথেষ্ট তরতম থাকলেও প্রয়োজন ও বাণিজ্যসাম্রাজ্যের প্রয়োজনের বিচারে পথলিপির ব্যবহার প্রায় একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত।

লারউড ও হটেন তাঁদের বইতে সেই ১৮৬৬ সালেই বিজ্ঞাপন হিসেবে ইউরোপীয় ক্ষেত্রে সাইনবোর্ডের ক্রম-গুরুত্বহীনতা লক্ষ্য করেছিলেন।



লন্ডনের রাস্তাঘাটের নামফলক

নিউ ইয়র্কের রাস্তার নামলিপি

তাঁরা লিখেছেন: ‘ইন দিজ মডার্ন ডেজ, দি সাইনবোর্ড ইজ এ ভেরি আনইম্পোর্ট্যান্ট অবজেক্ট; ইট ওয়াজ নট অলওয়েজ সো’ এর কারণ হিসেবে তাঁরা যা লিখেছেন তাকে প্রাচ্য জীবনধারা ও বাজারের তুলনায় বিপরীত ভাষ্য বলে আমাদের মনে হতে পারে। সম্ভবত তখন এমন একটা সময় যখন মানুষ লিখতে পড়তে জানতো না, তখন নগরজীবনে আয়ত্তিগুলির জন্য সাইনবোর্ড অপরিহার্য ছিল। মনে হয় অনেকটা

আমাদের দেশের ভোটের প্রতীক-চিহ্নের মতো ঝোপ, আঙুরগুচ্ছ, নানা-ধরনের বা নাগ’স্ হেড-এর সাইনেজ দেখেই পানশালার অবস্থান মালুম হতো সুরাসেবীদের কাছে। অচেনা বাড়ির পথ, চিহ্ন বা সংখ্যা না-থাকায় অবস্থিতিগুলির সাইনেজ থাকাটা আবশ্যিক ছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর প্রয়োজন কমতে থাকে। লারউড ও হটেন লেখেন যে, যখন বাসগৃহসহ, প্রতিটি আয়ত্তির সংখ্যা নির্ধারণের ব্যবস্থা চালু হলো এবং প্রতিটি রাস্তার শুরু এবং শেষে রাস্তার নাম লেখার ব্যবস্থা হলো, তখন সাধারণ সাইনবোর্ডের আর ইতিবাচক প্রয়োজনীয়তা থাকল না—এগুলোর আসল মূল্য হারিয়ে গেল এবং ‘এগুলো তাদের উপযোগিতার কারণে নয়, বরং আমাদের পূর্বপুরুষদের আলাংকারিক রসবোধের উদাহরণ হিসেবে, অথবা প্রতিষ্ঠালব্ধ খ্যাতি এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের বিজ্ঞাপন হিসেবে টিকে থাকল।’

সুমন দেখলেন লারউড ও হটেনের এই নির্ণয় এখন ভোগ্যপণ্যের অবাধ বিকিকিনি এবং মুনাফালাভের সীমাহীন প্রকল্পের কাছে পরাজিত হয়েছে। বিশেষ করে এখন শিল্পোৎপাদনের নিরিখে, প্রযুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের এবং তাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে পিছিয়ে থাকা দেশগুলিতে মুনাফালালসায় গ্রাহকদের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের লুক্কজ্ঞাপনের জন্য পথলিপি ব্যবহারের দাপট সমস্ত সীমারেখা অতিক্রান্ত করে গেছে! বহু ক্ষেত্রে রাস্তাই অবলুপ্ত হতে বসেছে। লন্ডনের মহা-অগ্নিকাণ্ডের মতো পরিস্থিতি দুশো-আড়াইশো



কলকাতার রাস্তার এবং হগ মার্কেটের নামাঙ্কন

বছর পরে উদারতার নামে নগরজীবনকে আবার বিপন্ন করতে পারে—  
এনডেল, লারউড-হটেনের পূর্বানুমান এতটা দূরে পৌঁছতে পারেনি!

সুমন এ-ও দেখলেন যে, আমাদের মতো বহুভাষার দেশে পথলিপিকে,  
সাইনবোর্ডের জ্ঞাপনীকে কেমনভাবে এবং সাংস্কৃতিক অবনমন ও  
আগ্রাসনের উপাদান হিসেবে কতটাই ব্যবহার করা যেতে পারে— এমন  
সমস্যা বা সম্ভাবনার কথাও এনডেলের মতো অপরাপর লেখকেরা ভেবে  
দেখেননি।

কিন্তু পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত ও সাক্ষরতায় এগিয়ে থাকা শহরগুলির  
তুলনায় আমাদের প্রাচ্যের, ভারতবর্ষীয় বাস্তবতা বহুলাংশে ভিন্ন হলেও  
লারউড ও হটেন ঠিকই বলেছেন যে, বিশাল ‘লন্ডন ডিরেক্টরি’তে  
উল্লেখিত মহানগরীর শত শত রাস্তার নামের মধ্যে বহু নামই সেই এলাকার  
পুরোনো সরাইখানা, পানশালা ও পাবলিক হাউজের নামের থেকে  
নেওয়া হয়েছে। আমরাও ইতোপূর্বেই ভিন্ন প্রসঙ্গে এ-বিষয়টি উত্থাপন  
করলেও এখানেও একথা বলতে হবে— আমাদের কলকাতা বা অন্যান্য  
শহরেও পেশা, বৃত্তি, কৌলিক পরিচয় বা ব্যবসার কথা লগ্ন হয়ে থাকে  
পল্লী ও রাস্তাগুলির নামের (কলুটোলা স্ট্রীট, শাঁখারিটোলা, পটুয়াটোলা,  
পার্শ্ববাগান, কুমারটুলি, মলঙ্গা লেন ইত্যাদি) সঙ্গে। পরম্পরার এই  
সৌরভও কম পাওয়া নয়!



বিপরীত চালে সভ্যতা। সভ্যতার বন্দনা নাকি কর্পোরেট বাণিজ্যগ্ৰাহসমনকে ব্যঙ্গ?  
মুশ্বইয়ের রাস্তায় টাইলারের কাজ।



শেপার্ড ফেয়ারির আঁকা গ্রাফিতি



ব্যঙ্কসির বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী গ্রাফিতি-গাল্



ব্যাঙ্কসির বিখ্যাত গ্রাফিতি



গ্রাফিতি-বিরোধী রাষ্ট্রশক্তিকে  
ব্যঙ্গ করে ব্যাঙ্কসির গ্রাফিতি



প্যালেস্টাইনে ব্যাঙ্কসির গ্রাফিতি-১



প্যালেস্টাইনে ব্যাঙ্কসির গ্রাফিতি-২

**BIG BROTHER**



**IS WATCHING**

**YOU**

২৪

## জীবনের ছায়াছবি : পরম্পরাহীন পূর্বাপর

ফাটা-ফুটি মেঝেতে কার্টনের টান টান বোর্ড পেতে সাদা হাফ-ডিমাই কাগজ ছড়িয়ে পোস্টার লিখনরত শিবেশ আর যতীশ; ঘরের এককোণে রসেবশে গুম হয়ে শুয়ে আছে বাদল মুগ্ধি।

বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে মাঝে মাঝে সে এই ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। জিজ্ঞেস করলে বলে, ‘আজ আমার বাড়িউলির সঙ্গে তকরার হয়েছে। আজ এখানে আপনার ঠেঁয়েই রইব!’

প্রথম প্রথম সুমন ভারি ব্যস্ত হয়ে তাকে ঘরে পাঠাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বাদলা সেসব অগ্রাহ্য করে মেঝেতে শুয়েই নাক ডাকতে শুরু করে দিত। সুমন শিবেশরা কেউ থাকলে তাদের বলতেন বাদলের বউকে খবর দিতে। শিবেশ হেসে বলে— ‘আপনে দাদা শুদুয়ুদু ঘেবড়ে যান, বোদি বাদলদার বাস পায়, এল বলে।’ দেখতেন শিবেশদের কথা সত্যি করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাদলের বউ যেন বাদলের গন্ধ শুঁকেই হাজির হয়েছে ঘরের দরজায়। আর কী আশ্চর্য, বউ এলেই বাদলের নাক-ডাকা বন্ধ, দিব্যি ভালোমানুষের মতো বউয়ের পিছু পিছু ঘরে ফিরে যায় সে— ‘তকরার’ বা ঝগড়ার তেমন কিছু বোঝা যায় না।

রাত বাড়ে, সুমন কখনও কখনও চৌকি থেকে নেমে গিয়ে ওদের কাজে যোগ দেন।

অল্প সময়ে দেয়ালের বুকে বহু-সংখ্যক পোস্টার লেখার কৌশল শেখান যতীশ-শিবশদেব। গ্রাফিতি-পর্বের অনুসরণ করে শিখিয়ে দেন স্টেনসিল-রহস্য। প্রথমে মোটা তেল-কাগজ বা পাতলা পিচবোর্ডের, প্লাস্টিক পাতে কাটারের মতো ছুরি দিয়ে কেটে তৈরি করা হয় সছিদ্র স্টেনসিল।

বাদল মুন্সি মজা পেয়ে শক্ত অথচ পাতলা প্লাস্টিকে এবং পরে জি আই টিনে একবার লিখে দিলে বাটালি দিয়ে কেটে পোক্ত স্টেনসিল বানিয়ে দিতে থাকে। গ্রাফিতির লুকোচুরি-খেলায় স্টেনসিলের সছিদ্র-দাগগুলি মোটা রঙে ঢেকে দেওয়া হয়। গঞ্জের সীমানা ছাড়িয়ে দেয়াল-ধিক্কার ছড়িয়ে পড়ে বড়ো-মেজো জেলা শহরে। কারা করে এই গেরিলাশিল্প তা জানা যায় না! অস্থিরতা ও হেনস্থা বেড়ে যেতে থাকে। সম্ভাব্য লিখিয়েরা চড়-চাপড় খেতে থাকে। কোথাও কোথাও চোর-পুলিশের খেলাও চলতে থাকে। নেতা-নেত্রীরা ভারি চিন্তায় থাকেন, কখন দেয়ালের লেখায় বা তুলির টানে তাদের অবয়ব ফুটে ওঠে! কোথায় নিরন্তর বানানো প্রখর-প্ররোচনাগুলি চপেটাঘাত প্রাপ্ত হয়!

রাতারাতি স্বপ্ন-বয়ানের নানা ধরনের পোস্টারে ভরে যেতে লাগল গঞ্জের দেয়ালগুলো। এটা শুরু হয়েছিল চণ্ডীমাতা গার্লস স্কুলের পাঁচিল থেকে। নতুন পাঁচিলের গায়ে কে বা কারা কদর্য হস্তাক্ষরে লেখা পোস্টার সাঁটিয়ে দিয়ে যাওয়ার পর হেডমিস্ট্রেস বিজ্ঞাপন না-মারা নির্দেশনা জারির জন্য চারপাশের পাঁচিলে একগজ অন্তর ‘বিজ্ঞাপন মারিবেন না’ গোছের লেখার জন্য যতীশদেব বরাত দিলেন। চণ্ডীমাতা গার্লস তিনটে হস্টেল সমন্বিত উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। প্রায় তিন একর জমি জুড়ে তার বিস্তার, সেখানে এক গজ অন্তর অন্তর...! স্কুলের কাজ, তায় হেডদিদিমণি কাজ দিয়েছেন! রঙের পয়সা ওঠা কঠিন!

দুই বন্ধু যখন চিন্তাক্লিষ্ট তখন সুমন গ্রাফিতি করার সময়কার স্টেনসিলেরই

পথ দেখালেন। ইংরেজি ও বাংলায় একটিই স্টেনসিল কাটা হলো। একদিনে কয়েক ঘণ্টায় দুজনে কাজটা করে ফেলল। রঙও খরচা হলো কম।

# বিল্ডিংগন মারিবেন না STICK NO BILLS

প্রথম থেকেই সুমন একটি ব্যাপারে সজাগ ছিলেন, যেন কোনোমতে গ্রাফিতির সঙ্গে এই স্টেনসিলের কাজের কোনো মিল না থাকে। সেই কারণে লেখাগুলি স্টেনসিলে করা হলেও মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী এমন কিছু সামাজিক বার্তাবাহী ছবি দেওয়া হলো যা চিরকাল সব শাসকের সুভাষিতাবলীর মধ্যে পড়ে। যেমন— শিক্ষাই জাতির সম্পদ, সবার জন্য শিক্ষা, মায়ের শিক্ষা হলে 'পরে শিশু শেখে মায়ের কোলে, সর্দি কাশি জ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, যক্ষা, ডেঙ্গু থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতা, দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জ্ঞান, বাল্যবিবাহের বিরোধিতা, নারীশিক্ষা ও নারীশক্তির জয়গান ইত্যাদি ছাড়াও মনীষীদের ছবিসহ তাঁদের বাণী। আর সরকারি কিছু প্রচারমূলক শ্লোগান। মানে একটা আদর্শ ইঙ্কুলের গায়ে যা যা থাকা উচিত— এই আর কী। সুমনের পরিকল্পনা-অনুযায়ী কোথাও যেন অতিরিক্ত বুদ্ধির ব্যয়ামের প্রকাশ না-ঘটে! প্রয়োগযোগ্য বুদ্ধির মতো এমন বালাই আর এখনকার পৃথিবীতে নেই!

ফলত কোথাও কোনো তরঙ্গ দেখা দিল না, বরং সিডিকোডে পর্যন্ত বহু স্কুলের পাঁচিলে ছবি আঁকার বরাত পেল শিবেশ্বর।

সুমনের পরামর্শে অবসর সময়ে স্থায়ী শ্লোগানগুলি স্টেনসিল করে রাখা

হলো। এমন-কী কয়েকটি রেখাঙ্কিত ছবিকেও স্টেনসিলে রূপ দেওয়া হলো। যেমন: চে গুয়েভারার মুখাবয়বের যে ছবিটি বিশ্ববিপ্লব ও প্রতিবাদের বিশ্বপ্রতীকে পরিণত হয়েছে।

চলচ্চিত্রকার জাঁ লুক গোদার নাকি একদা নিজের ছবি প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, প্রত্যেকটি গল্পের একটি সূচনা, একটি মধ্যস্থান এবং একটি সমাপন থাকে। কিন্তু এই ক্রম সর্বত্র একই রকমভাবে বজায় থাকে না। জীবনের গল্পও অনেকটা তাই-ই।

আড়াই দশকেরও পর এখনও মনে হয়— যেন এই তো সেদিন তিনি বিকেলের স্নান আলো গায়ে মেখে স্টেশনে এসে নামলেন।

বরং আজ তিনি এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে, স্টুডিও, গ্যালারি বা মিউজিয়াম নয়— বিজন প্রান্তরও নয়— ঘরের চার দেয়ালের বাইরের জনব্যবহার্য স্থান— রাস্তাঘাট বা পথলগ্ন প্রাকারগাত্রই সাধারণজনের কণ্ঠস্বর ও অভাব-অভিযোগের ইশতেহার দাখিল করার উপযুক্ত জায়গা। এমন-কী শিল্পকে যদি বৃহত্তর পরিসরে নিজের সৃজনের জনস্বীকৃতি দাবি করতে হয় তা হলেও প্রকাশ্য দেয়ালই তার উপযুক্ত স্থান। শুধুমাত্র প্রাকার গাত্রকে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারলেই শিল্পাঘাতে, শিল্পিত-ইশারায় জনপদগুলি জেগে উঠতে পারে, তার অসাড় ধমনীর শীতলতায় প্রবেশ করতে পারে বোধের জাগরণ, প্রাণের স্পন্দন এবং দৈনন্দিনের চঞ্চলতা! যদি তা ঘটে, তবে হরফের জাদু, রেখার চলন, রঙের অনুক্রিয়ায় ‘সামাজিক যুদ্ধের’ সংঘর্ষক-অনুভূতি বেঁচে থাকার মহৎ আশ্বাস লাভ করে। আর তখন শিল্পের কার্যকারিতা এবং শিল্প-উপভোগের মাত্রা শঙ্কাহীন আনন্দে রূপান্তরিত না-হয়ে থাকতে পারে না।

সাইনবোর্ড নির্মাণের কাজে অনেকগুলো বছর পার করার পর সুমন স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন সাইনবোর্ডের ইতিহাস আসলে রাস্তার বা প্রকাশ্য প্রাকার শিল্পের ইতিহাসেরই বৃহত্তর অংশ। সেখানে দেয়াললিপি ও চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে পোস্টার (প্রায়শই কাগজে, কচ্চিৎ-কখনও

অন্যকিছুতে), ফ্রেসকো, মুরাল, গ্রাফিতি ইত্যাদি বহু ধরনের অভিব্যক্তিক মাধ্যম-পদ্ধতি-প্রক্রিয়া। কিন্তু এর প্রায় সবটাই প্রকাশ্য প্রাকার-শিল্পের অন্তর্গত। এদের প্রত্যেকটিই একই সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং প্রত্যেকটিই বাচনিক গভীরতা, প্রকাশমাধ্যম, প্রকাশভঙ্গি ও সার্বিকভাবে শৈল্পিক রসনিষ্পত্তির দিক দিয়ে পরস্পরের থেকে আলাদা।

খোয়াইয়ের মাঝ-দিয়ে চলে যাওয়া জলধারার মতো সূক্ষ্ম এক তিরতিরে গোপন ব্যথার সুগোপন অনুভব ব্যতিরেকে সঙ্গীসাথী, সুধা-সালেম, শিবেশ-যতীশ, গোপাল বাড়ুজ্যে-বীরেন ভট্টাচার্যদের নিয়ে জীবনে এত ভালো, এবং একই সঙ্গে চতুর্পার্শ্বের গড্ডলশ্রোতে ভাসমান জনসমাজ নিয়ে এত অস্বস্তিতে কখনও ছিলেন না সুমন। গঞ্জে নতুন সাইনবোর্ড দেখলেই সকলের চোখ বোর্ডের ডাইনে-কোণায় চলে যেতো, সেখানে দারুণ হস্তাক্ষরে স্বাক্ষরের চঙে লেখা থাকতো— ‘সুযশিবা’ তাঁদের দলের চারজনের নামের আদ্যাক্ষরই ছিল এই স্বাক্ষরে!

কিন্তু মানুষের দিন তো নিজের ইচ্ছে মতো প্রকৃতির স্বাভাবিক বৈশ্বিক ছন্দে বয়ে যেতে পারে না। সেখানে মানুষের নিজের সৃষ্ট কত বাধা। ধরো উন্নতির নাম করে বিরাট বাঁধই দিয়ে দিল প্রাণবন্ত নদীটার মাঝে, কিংবা বাঁধাল দিয়ে দিয়ে জলশ্রোতকে বদ্ধ ডোবায় পরিণত করল, মাটি ফেলে জল-বিভাজিগুলিকে বুজিয়েই অট্টালিকা তৈরি হলো, চমৎকার খোয়াইয়ের স্থাপত্যের মাঝে হাঁকিয়ে দিল সরাইখানা, ময়লা ফেলে ফেলে প্রতিটি যাপনকে পুতিগন্ধময় করে দেওয়া হলো। কিংবা নতুন কিছুর নামে অমন চমৎকার মোটা ও অলংকৃত থামওয়ালা হর্ম্যটিকে না-হক ভেঙে ফেলে খোপ খোপওয়ালা একটা এক-ঠেঙে ঢ্যাঙা টাওয়ার বানানো হলো, অপ্রয়োজনীয় তৎপরতার সঙ্গে বদলে দেওয়া হলো নিয়মকানুন, অকারণে ভেঙে বাতিল করে দেওয়া হলো স্থিতাবস্থার সমস্ত ধারণাকে। প্রকৃতির পরিবর্তনের কিছু নিয়মকানুন আছে, সে তার পথটাকে সোজা করে নেয়, কিন্তু মানুষের স্বার্থকলুষিত বেছন্দ নষ্টামির তো কোনো সীমা-পরিসীমা নেই!

একদিন মধ্য-সকালে শিবশ কোথা থেকে হা-হুদ হয়ে সাইনবোর্ড লেখার ঘরটিতে এসে ঢুকল— ‘হয়ে গেল দাদা!’

শিবশের গলায় ছিল যথেষ্ট উদ্বেগ, শরীরীভাষায় বিনষ্টির অশান্তি।

জানা গেল: স্টেশনের বাইরে বিরাট এক বিজ্ঞাপনী বোর্ড বসেছে এক নাম-করা ইলেকট্রিক পাখার কোম্পানির। কিন্তু বোর্ডটা প্লাস্টিক আর টিনের বাস্তু দিয়ে তৈরি, সদরের দোকানপাটের বিজ্ঞাপনের মতো, রাতে ভেতরে রড-লাইট জ্বলবে।

সুমন কলকাতার মানুষ। তিনি এমন কতো বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পরিচিত। সেখানে নিয়ন টিউব সাইন, ফ্লুরোসেন্ট সাইন, প্লাস্টিক সাইনের যুগ কবেই শুরু হয়ে গেছে। কাপড়ে ছাপা ব্যানারও সেখানে সহজলভ্য। প্লাস্টিক বোর্ডের সবটাই মেশিনে তৈরি। শিবশ উদ্ভিগ্ন হয়েছিল এই কারণে যে, রাস্তা বরাবর যত ইলেকট্রিকের দোকান তার সর্বত্র ঐ ছোটোমাপের এমন বোর্ড কোম্পানি থেকে নিখরচায় লাগিয়ে দিয়ে গেছে। তিতাস নদীতে যেদিন প্রথম টের পাওয়া গিয়েছিল নদীর স্রোতের অক্ষিসন্ধির হেরফের, জেগে উঠেছিলো চর, সেদিন তিতাসের তীরের জেলেগুলোর যে অবস্থা হয়েছিল আজ শিবশদের অনেকটা সেই অবস্থা বলে মনে হলো সুমনের। তিনি ব্যতিব্যস্ত হলেন না মোটেই। শুধু মনে হলো অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘ভাসমান’ অংশে জেলেগোষ্ঠীর সমাজবন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়ার সূচনার মতো এই একান্ত গঞ্জটির নিজস্বতার বিনষ্টিরও হয়তো সূচনা হলো এইবার। তাঁর তো ভয় পাওয়ার কোনো হেতু নেই, তিনি তো অতিথিমাত্র। অর্থ উপার্জন বা সঞ্চয় করতে আসেননি তিনি। কী যে তিনি করতে এসেছিলেন, উদ্দেশ্য বা বিধেয় তাঁর কী ছিল তা সেদিনও তিনি জানতেন না, আজও জানেন না। ঘরের স্থিতি তো তাঁর নয়!

শিবশের ভাবভঙ্গিতে সুমন সেদিন হেসেছিলেন, বলেছিলেন, ‘অত উন্মোচিত হওয়ার কিছু নেই। জেলা সদরে গেলেই তো এমন বোর্ডের রমরমা দেখতে পাবি। এটা ভারতবর্ষ, ট্রাক্টর এসেছে বলে হাল-লাঙল

বাতিল হয়ে যায়নি।’

অমন বোর্ডের সংখ্যা বেড়েই চলল।

যেদিন সদরে প্রথম কম্পিউটার চালিত ডিজাইন-ব্যবস্থা চালু হলো, যেদিন ভিনাইল কাটার মেশিন বসল, যেদিন কলকাতা থেকে প্রথম সস্তার পি ভি সি ব্যানার, ফ্লেস্ক প্রিন্ট করে এনে তাকে ফ্রেম-বন্দী করে টাঙিয়ে দেওয়া হলো, তখন থেকে গঞ্জের শিল্প-সৌন্দর্য-রুচি-বুদ্ধি সস্তার কাছে নিছক প্রয়োজনের কাছে হার মানতে শুরু করল। তাঁদের তুলিবন্দী শিল্পশালাকে দূরে সরিয়ে সদরে সাইন-মেকিং ইণ্ডাস্ট্রির কম্পিউটার-কাট লেটারিং, এলোপাথারি মাল্টিকালারিং, সময় ও অর্থসাশ্রয়ী ভৌতামি নিঃসংশয় আশ্রয় লাভ করল। যেহেতু যন্ত্র ও প্রযুক্তি নির্ভরতা, পুঁজিলিপির ক্ষমতা, হরফের মাতলামি, রঙের অরাজকতার কাছে শিল্পীর সুনাম, শিল্পদক্ষতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্থহীন ঠেকলো আমজনতার কাছে, সেহেতু আহত-অভিমনে আক্রান্ত হলো শিবশ-যতীশের দল। আদিখ্যেতা করে কী বলে যেন, ঐ যে— ‘মনের মাধুরী’ সেটা বহুলাংশে অপয়োজনীয় বলে সাব্যস্ত হলো। তবে দ্বিমুখী যান্ত্রিক দক্ষতার বিপুল বিস্ফার ডিজিটাল ইমেজের মুহুমুহু বৈচিত্র্য, ক্রমাগত সাইনবোর্ড পরিবর্তনের সংস্থান, আলো-ব্যবহারে সাবলীলতা ইত্যাকার সুবিধার কথাও বিবেচ্য।

ছোটো কাজগুলো, যে-কাজে মানুষের হৃদয়ের প্রয়োজন, যে-কাজে স্কিম ও যোগ্য স্কিমারের প্রয়োজন সেখানে রঙতুলির মূল্য থেকে গেল, ‘সুযশিবা’ গঞ্জের রাস্তায় বিরল প্রদর্শনরূপে অদ্যাবধি শোভা পেতে লাগলো। নেহাতই গঞ্জ বলে সবটা বাতিল হতে সময় লাগলো কয়েক বছর।

তাঁর চ্যালারা প্রায় সেলসম্যানের মতো কাজ সংগ্রহ করে আনতে লাগল। আপাতত চলতে লাগল সবকিছু পরিবর্তিত পেশার কথাও ভাবছিলেন তাঁরা। সুমন ভাবছিলেন যতীশ আর শিবশদের কথা। এতকাল যে-কাজ তাঁরা করেননি সেই কাজ করলেন সুমন। সুধাময় সেই পথ দেখালো।

বাহনচিত্রনের কাজে হাত দিলেন তাঁরা। গঞ্জে হালদারদের একচেটিয়া গাড়ির ব্যবসা। সদর আর মহকুমার মধ্যে রাজ্য সড়ক দিয়ে তাঁদের তিন ভাইয়ের তিন জোড়া বাস চলে— লরি, ষোলো চাকা, ফুল পাঞ্জাব, টেম্পো, ম্যাটাডোর, ছোট্ট হাতি মিলিয়ে আরও দশ-বারোটা গাড়ি মাল টানে— কলকাতা থেকে বিহার-ঝাড়খণ্ড-আসাম পর্যন্ত তাদের সার্ভিস। সুমন নিজে গেলেন হালদারদের দৌর্দণ্ডপ্রতাপ ম্যানেজার সত্য কয়ালের কাছে। সত্য কয়াল এককথার মানুষ। বার্ষিক চুক্তিতে সেসব বাহন রঙ করা, নামলিপি থেকে প্রতিটি বাহনের সামনে-পেছনে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়— লেখালেখির সর্বদায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করল সত্য কয়াল। যতীশ আর শিবেশের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সুমন প্রথমেই হালদার অ্যাণ্ড সন্স ট্রান্সপোর্ট-এর খান-পাঁচেক মনোগ্রাম বানিয়ে ফেললেন। কর্তাদের অনুমোদন নিয়ে তার একটা নির্বাচন করলো সত্য কয়াল। সেই মনোগ্রাম-সাইনটি মোটা লোহার গোলাকার শিটে ঐক্রে প্রত্যেকটি গাড়ির শিরোদেশে ও পশ্চাদ্দেশে অবতলের থেকে একটু উঁচু করে লাগিয়ে দিলেন।

সুধাময় কলকাতার বড়োবাজারে মাল কিনতে গিয়ে হ্যাণ্ড স্পেয়ার এনে দিল। নতুন অভিযাত্রা শুরু হলো ‘সুযশিবা’-এর। বদলে গেল গাড়ির রঙের তরিকা, বছরের পর বছর রঙ না-করানোর উদাসীন আলস্য ও কঞ্জুষতা, ফুল-লতা-পাতা-পাখিটাখির রেখাঙ্কনের অতিচার, রঙ লেপার ভ্রান্তিবিলাস, বাহনলিপির অমিতাচার। সুযশিবির হাতে প্রচলন হলো রুচিশীল লিপিমানার ব্যবহার। বার্ষিক চুক্তি-অনুযায়ী বাসগুলি বাদ দিয়ে অন্যান্য বাহনগুলির প্রতিটি যাত্রার পর সেগুলিকে দেখাশোনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তার রঙের আহত-ওজ্জ্বল্য ফিরিয়ে দিতে লাগলো যতীশ-শিবেশরা। বাসগুলিকে সপ্তাহে একদিন! সত্য কয়ালের পর কত বাহনের শিরোদেশের ও পেছনের কাছে তাঁরা অসংখ্য লিপিচিত্র লিখে দিলেন। সুধাময়, সালাম, গোপাল খলিফা, তিনু পোদ্দার সকলেরই

আপাতত চিন্তামুক্তি ঘটলো।

ওদিকে রেডিমেড পোশাক-বিপ্লবের ধাক্কায় রাখাক্ষণ টেলার্স আর তার মালিক গোপাল বাড়ুজ্যের টেলারিংও প্রায় কাত। তবে কী-না বাড়ুজ্যেমশাইয়ের পরিচিতি ও বন্ধুবৃত্তি সুবৃহৎ। ফলে তাঁরা সমর্থন জারি রাখায় তিনি অর্ধ-বরাতে চালিয়েও খুশি ছিলেন, সন্ধ্যাবেলায় চায়ের যোগানও অব্যাহত রইলো।

বিলুপ্তির হাত থেকে মুক্তির এই সংগ্রামে মানস-সমর্থন পেয়ে শিবেন-যতীশ-বাদলারা শ্রম-বিশ্রাম-আনন্দ ফিরে পাচ্ছিল যেন।

শুধু চারপাশে অব্যবস্থিততার একটা স্বস্তিহীন বোধ— একটা অচিহ্নিত তিরতিরে ব্যথা, একটি অজ্ঞাতকুলশীল বেদনার অনুভব, ছন্নতার আশঙ্কাদীর্ঘ ভবিতব্য-ভারাতুর এক মেদুরতা ভেতরে ভেতরে ঘনিয়ে থাকলো নিরন্তর— কোন অস্থিতির পালা এবার! কে জানে— কোন্ উন্নয়নের বোমারু বিমান কোন্ নিরাশ্রয়ী আতঙ্কের লক্ষ্যবস্তুর খোঁজে আছে...।

সম্পূর্ণ বইটি পড়ার আগ্রহ হলে সংগ্রহ করার জন্য  
আপনার কাছের বইয়ের দোকানে বলতে পারেন।  
সরাসরি প্রকাশকের কাছ থেকেও সংগ্রহ করতে  
পারেন। প্রকাশকের ঠিকানা ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর  
দেওয়া রইলো।

সুপ্রকাশ

কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ায় বিক্রয়কেন্দ্র

সুপ্রকাশ

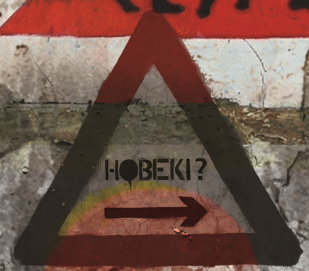
১৬, রাধানাথ মল্লিক লেন

কলকাতা ১২

বাণিজ্য-আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ : ৯৪৭৭৫৩০৪৪০



সুযোজিত হুই দ্যাকি... যা এখন সমস্যা



বিস্তারিত  
STICK N

স্বল্পত্ব সংক্রান্ত গবেষণা  
সংক্রান্ত গবেষণা

বিশ্বব্যাপী প্রভাব  
সামাজিক  
সামাজিক  
সামাজিক



RIGHT WIN  
OF CLIMATE CHANGE  
Has obstinence is the  
humans are the produ





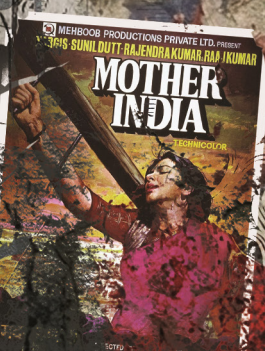
मिर्चिका का  
STICK NO BILLS

विद्रोहीन मारिचिका का  
STICK NO BILLS

BLACK  
LIVES  
MATTER

... a piece

DENIED SCIENCE  
... also claims  
best birth control  
product of intelligent design



‘দেয়ালের লেখা : এক অন্তহীন প্রকীর্ত শিল্পকথা’-পড়ার ভূমিকা-পুস্তিকা



CUT  
MORE  
STENCILS

DEMAND  
WORK OR WAGES!

# স্বাধীনতা

